সত্যমিথ্যা

প্রফুল্ল রায়

 উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির

মেল ট্রেনটা এখন প্রায় পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটছে। একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের জানালার ধার ঘেঁসে চুপচাপ বসে আছে সন্দীপ। তার দু চোখ বাইরে ফেরানো। অন্যমনস্কর মতো সে দৃশ্যটৃশ্য দেখছিল।

সময়টা অক্টোবরের মাঝামাঝি। কয়েকদিন আগে পুজো গেছে। শরৎকাল প্রায় ফুরিয়ে এল। কিন্তু আকাশ এখনও আশ্চর্য নীল। মনে হয়, দিগন্তের ফ্রেমে কেউ যেন একখানা পালিশ করা নীল আয়না আটকে রেখেছে। অবশ্য অনেক দূরে এলোমেলো দু-এক টুকরো সাদা মেঘ আর নরম সিল্কের মতো ফিনফিনে একটু কুয়াশা চোখে পড়ে।

এখনও ভাল করে সকাল হয় নি। রোদ উঠতে কম করে আধ ঘণ্টা বাকী। তবে চারদিক ফর্সা হয়ে গেছে। দুধারে যত দূর চোখ যায় অফুরন্ত ধানের ক্ষেত। ক্বচিৎ এক-আধটা তাল গাছ মাঠের মধ্যিখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের স্পীডের জন্য টেলিগ্রাফের পোস্টগুলো চিরুনির দাঁতের মতো ঘন দেখাচ্ছে। আর গাছগাছালি মাঠঘাট পেছন দিকে ছুটে যাচ্ছে।

এই কামরায় মোট চারটে বার্থ। সন্দীপ ছাড়া বাকী তিনটে বার্থে তিনজন প্যাসেঞ্জার এখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের নাকে সরু-মোটা-ভারী ইত্যাদি নানা ধরনের আওয়াজে অদ্ভুত ধরনের অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে।

কাল সন্ধেবেলা বেনারস থেকে এই মেল ট্রেনটায় উঠেছিল সন্দীপ। সে জানে গাড়িটা দশটার মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছে যাবে।

যদিও সন্দীপরা বাঙালী তবুও আগে আর কখনও বাঙলাদেশে আসে নি। এই প্রথম কলকাতায় যাচ্ছে সন্দীপ। যাদবপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এ্যাডমিসান পেয়েছে সে। তার বাবা অবশ্য তার

কলকাতায় আসা একেবারেই পছন্দ করেন নি কিন্তু নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজী হতে হয়েছে।

সন্দীপরা প্রবাসী বাঙালী। বেনারসে বেনিয়াবাগে ওদের বাড়ি। তবে ও পড়াশোনা করত এলাহাবাদে। এলাহাবাদ থেকে এ বছর বি. এস-সি পাশ করার পর বেনারস পিলানি কানপুর খড়্গাপুর, নানা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অ্যাডমিসানের জন্য দরখাস্ত করেছিল সে। যাদবপুর ছাড়া আর কোথাও চান্স পাওয়া যায় নি।

যাদবপুরে হস্টেলের সুবিধা আছে। চিঠি-টিঠি লিখে সেখানে একটা সীটের ব্যবস্থা করে ফেলেছে সন্দীপ। হাওড়ায় নেমে সোজা হস্টেলে চলে যাবে সে।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। কুয়াশা যেটুকুও বা ছিল, উধাও হয়ে গেছে। এদিকে কামরার অন্য তিন প্যাসেঞ্জারের ঘুম ভেঙেছে। নিচের বার্থে যে ছিল সে এখন টয়লেটে। আপার বার্থের ছ'জন নিচে নেমে ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজছে। তাদের একজন বাঙালী, আরেক জন নন-বেঙ্গলী, খুব সম্ভব মাড়োয়ারী। বাঙালীটি জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে কী দেখল। তারপর বলল, 'ট্রেনটা ভালই যাচ্ছে। রাইট টাইমেই ক্যালকাটা পৌছনো যাবে।'

মাড়োয়ারীটি বলল, 'হাঁ। সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

'আজকাল ট্রেনে কারেক্ট টাইমে পৌছনো আর লটারি পাওয়া এক ব্যাপার।'

এ ব্যাপারে মাড়োয়ারীটির দ্বিমত নেই। মাথা নেড়ে সে সায় দিল, যা বলেছেন—'

'কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে—'বাঙালীটিকে এবার চিন্তিত দেখায়।

মাড়োয়ারী তার দিকে তাকিয়ে কৌতূহলের ভঙ্গিতে শুধোয়, 'কী হল?'

'সাড়ে ন'টায় হাওড়া পৌছলে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব। অফিস টাইম তখন—'

'হাঁ। ঐ টাইমে কলকাত্তায় ট্যাক্সি পেতে জান বরবাদ হয়ে যায়। তবে আমার কোঠি থেকে গাড়ি আসবে। সেই রকম ব্যবস্থা করা আছে।'

বাঙালীটি চারদিক দেখে গলা খাটো করে এবার জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

মাড়োয়ারী বলে, 'গিরিশ পার্ক।'

'আমি থাকি বীডন স্ট্রীটে। দয়া করে যদি আপনার গাড়িতে একটা লিফট্ দেন, মানে ট্যাক্সির ব্যাপারটা—'

হাতের আঙুলে অভয়মুদ্রা ফুটিয়ে মাড়োয়ারী আশ্বাস দেয়, 'জরুর, জরুর লিফট দেব। চিন্তা মাত কীজিয়ে।'

'আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব—'

'কুছু বলেই দেবেন না। এ হামার ডিউটি। ইণ্ডিয়ানকে ইণ্ডিয়ান না দেখলে কে দেখবে! হা হা-হা—'থলথলে ভুঁড়ি দুলিয়ে মাড়োয়ারী হাসতে থাকে।

সন্দীপ ওদের কথা শুনছে না। বাইরেই তাকিয়ে আছে। শরৎশেষের উজ্জ্বল সোনালী রোদে চারদিকে এখন ভেসে যাচ্ছে।

এখন সাড়ে সাতটার মতো বাজে। রেলের টাইম টেবল অনুযায়ী ট্রেনটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের সীমানার মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আগেই ঢুকে পড়েছে।

সন্দীপ একুশ পেরিয়ে বাইশে পড়েছে। আগেই জানানো হয়েছে, বাঙলাদেশে আর কখনও সে আসে নি। তবু শরতের এই টলটলে রোদ, কোমল উজ্জ্বল নীলাকাশ বা সবুজ ল্যাণ্ডস্কেপ, সব যেন খুবই চেনা তার। মনে হয়, এ সবই বহু আগে তার অনেক বার করে দেখা। কেন এমন মনে হচ্ছে, কে জানে।

হঠাৎ গাড়িটার স্পীড কমে এল। সামনে খুব সম্ভব কোন স্টেশন আসছে। জানালা দিয়ে তাকাতেই, যা ভাবা গিয়েছিল তাই, তিন চারশো গজ দূরে একটা স্টেশন চোখে পড়ল। ছোট স্টেশন মনে হচ্ছে। দূরপাল্লার মেল ট্রেনের এরকম জায়গায় দাঁড়াবার কথা নয়। হয়ত লাইন

ক্লিয়ারেন্স পায় নি।

স্পীড কমতে কমতে ট্রেনটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক চমকে উঠল সন্দীপ।

স্টেশনটার নাম পলাশপুর। দু'ধারে দুটো সুরকি বিছানো প্ল্যাটফর্ম। সে দুটোর মাথায় অ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত শেড। এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেক প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতের জন্য ওভারব্রীজও রয়েছে একটা। যেদিকটায় মেল ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে, লাল রঙের একতলা ছোট স্টেশন বিল্ডিংটা সেখানেই। একটা হতচ্ছাড়া চেহারার চায়ের স্টলও রয়েছে একধারে।

এই স্টেশনটা সন্দীপের খুবই চেনা। চেনা পলাশপুর নামটা। এলাহবাদে বা বেনারসে থাকতে বহুবার এই স্টেশনটার ছবি তখন চোখের সামনে ভেসে উঠত। সেই সঙ্গে যা ফুটে উঠত তা হল মারাত্মক দুর্ঘটনার স্মৃতি। একটি যুবককে এই রকম একটা মেল ট্রেন থেকে এই পলাশপুর স্টেশনের কাছে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তখনই উল্টোদিক থেকে আরেকটা ট্রেন দুর্দান্ত স্পীডে ছুটে যাচ্ছিল। যুবকটি সেই ছুটন্ত ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে গিয়ে পড়েছিল। এই ভয়াবহ দৃশ্য এবং এই পলাশপুর স্টেশন ফিক্সেসানের মতো তার মাথায় আটকে আছে। কেন এরকম হয়? অথচ সে তো কখনও এখানে আসে নি।

যাই হোক, এই মুহূর্তে সিনেমা স্লাইডের মতো সেই ভয়ঙ্কর হত্যার দৃশ্য আবার দেখতে পেল সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তেই তার গলার ভেতর থেকে চাপা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল।

সেই বাঙালী এবং মাড়োয়ারীটি থমকে সন্দীপের দিকে ফিরল। সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ভাই, লাগল-টাগল নাকি?'

'কী মোশা, তবিয়ত কি গড়বড়িয়ে গেল?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে আচ্ছন্নের মতো আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সন্দীপ। দারুণ ক্লান্ত গলায় বলল, 'না, কিছু হয় নি।'

মাড়োয়ারী ফের বলল, 'দেখবেন মোশা, কিছু অসুবিধা হলে বলবেন। বিপদে ইণ্ডিয়ানকে ইণ্ডিয়ান না দেখলে কে দেখবে।'

বাঙালী বলল, 'লজ্জা করবেন না ভাই—'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

একটু পর লাইন ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেল। ট্রেন আবার দৌড়ুতে শুরু করল।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় ট্রেন হাওড়া পৌঁছে গেল। সন্দীপের সঙ্গে মালপত্র সামান্যই। একটা মাঝারি মাপের ফোমের স্যুটকেশ, একটা হোল্ড-অল, একটা বেতের বাস্কেটে টুকিটাকি দরকারী কিছু জিনিসপত্র আর একটা ওয়াটার বটল। কুলী ডেকে তার মাথায় স্যুটকেশ হোল্ড-অল চাপিয়ে নিজের কাঁধে ওয়াটার বটল ঝুলিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে এল সে। আর নেমেই অবাক।

এই স্টেশনটাও তার অচেনা নয়। হাওড়ার একটা ছবি তার মাথায় কত কাল ধরে আটকে আছে। তার সঙ্গে এখনকার এই স্টেশনের তফাৎ সামান্যই। এত লোকজন আর গিজগিজে ভিড় মাথার ভেতরকার ছবিটাতে নেই। কেন এই জায়গাটা এত চেনা মনে হচ্ছে তার কোন কারণই বুঝে উঠতে পারছে না সন্দীপ।

কাউকে জিজ্ঞেস করার দরকার হল না। সন্দীপ যেন আগে থেকেই জানে, কোন্ দিকে বেরুবার রাস্তা, কোথায় বাস বা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। মানুষের স্রোতের মধ্যে ভাসতে ভাসতে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

খানিকক্ষণ বাদে গেটে টিকিট জমা দিয়ে বেরিয়ে এল সন্দীপ। যে ছবিটা তার মাথায় আটকে আছে সেটার সঙ্গে সে মিলিয়ে দেখল, হুবহু সবই এক। অগুণতি টিকেট কাউন্টারে লম্বা কিউ, এনকোয়ারি অফিস, পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের কাউন্টার, ভেজিটারিয়ান এবং নন-ভেজ কাফেটারিয়া, বুক স্টল, ফলের দোকান, ইত্যাদি। যেটুকু তফাত চোখে

পড়ল তা হল, তার ছবিটায় সাবওয়ে ছিল না, আর ছিল না ট্রেনের আসা-যাওয়ার সময় জানার জন্য ইলেকট্রনিক বোর্ড।

কারো সাহায্য ছাড়াই ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে চলে এলো সন্দীপ। ওধারে হাওড়া ব্রিজ, বড়বাজার, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং ইত্যাদি মিলিয়ে ক্যালক্যাটা মেট্রোপলিসের সুবিশাল স্কাই লাইন। সব, সব তার চেনা। তবে কুড়ি পঁচিশ বছর বাদে হঠাৎ কোন পরিচিত জায়গায় গেলে যেমন লাগে কলকাতাকে সেইরকম লাগছে। কিন্তু জীবনে যেখানে সে আজই প্রথম এল সেই শহর এত চেনা মনে হচ্ছে কেন ?

লম্বা কিউতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ট্যাক্সি ধরতে পারল সন্দীপ। মালপত্র ক্যারিয়ারে তুলে ভেতরে উঠে ট্যাক্সিওলাকে বলল, 'যাদবপুর চলুন—'

ট্যাক্সিটা সাবওয়ের পাশ দিয়ে ঘুরে হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে বড়-বাজারের মুখে এসে ফ্লাইওভারে উঠল। তারপর ব্র্যাবোর্ন রোড ধরে ডালহৌসি ছুঁয়ে সোজা রেড রোড।

মাথার ভেতরকার সেই ছবিটার সঙ্গে চোখের সামনের কলকাতার কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ছে সন্দীপের। সেই ছবিতে ফ্লাই-ওভার ছিল না, রাস্তাগুলো মনে হয় আরো নোংরা হয়েছে, তবে নতুন নতুন স্কাইস্ক্রেপারে শহর ভরে গেছে। ময়দানের ওধারে বিরাট বিরাট সব ক্রেন আর মাটির পাহাড়। বেনারসে থাকতে খবরের কাগজে কলকাতার মেট্রো রেল তৈরির কথা শুনেছিল। খুব সম্ভব ওখানে তারই কাজ চলছে। তবে সব চাইতে বড় তফাত যেটা চোখে পড়ছে তা হল মানুষের ভিড়। সন্দীপের মাথায় যে ছবিটা আছে তাতে এত লোক কলকাতায় ছিল না। 'পপুলেসন এক্সপ্লোসান' কথাটা কলকাতার দিকে তাকালে বোঝা যায়।

কিছু কিছু পরিবর্তন বাদ দিলে কলকাতা সন্দীপের খুবই চেনা। এত চেনা যে ট্যাক্সিওলা ঘুরপথে গিয়ে মিটার বাড়াবার মতলবে ছিল। সন্দীপ সোজা রাস্তা দেখিয়ে বলল, 'এদিক দিয়ে চলুন—'

যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, বহুকাল আগে সে যেন এখানে অনেক দিন থেকে গেছে। সে কি তার ছেলেবেলায়? কিন্তু মা-বাবার কাছে সন্দীপ শুনেছে, বেনারসে তার জন্ম, স্কুল এবং কলেজ লাইফ এলাহাবাদে হস্টেলে থেকে কাটিয়েছে। ঐ ছুটো শহর বাদ দিলে এধারে মোগলসরাই, ওধারে কানপুর লক্ষ্ণৌ গাজিয়াবাদ ছাড়া আর কোথাও সে যায় নি। ইউ-পি'র বাইরে যাওয়ার মধ্যে বার ছুই সে গেছে দিল্লী। ছেলেবেলায় একবার সেখানে গিয়ে ছিল দিন চারেক, আরেক বার এক সপ্তাহ। পুব দিকে মোগলসরাইয়ের এপারে আর আসেনি সে।

এক সপ্তাহ আর চারদিন অর্থাৎ পুরো এগারটা দিন কাটালেও দিল্লীর স্মৃতি তার কাছে প্রায় ঝাপসা হয়ে গেছে। লালকেল্লা, পার্লামেণ্ট ভবন, ইণ্ডিয়া গেট, রাষ্ট্রপতিভবন বা কুতুব মিনার—এ রকম ছু-চারটে ল্যাণ্ডমার্ক ছাড়া আর কিছুই তার মনে নেই। দিল্লীতে এখন নিয়ে তাকে ছেড়ে দিলে কোন রাস্তা কোন দিকে গেছে, কোথায় কোন পাড়া, কিছুই চিনতে পারবে না। অথচ যে শহরে সে কখনও আসে নি সেই কলকাতার টোপোগ্রাফি, কোথায় শ্যামবাজার, কোথায় টালা আর কোথায় পার্কসার্কাস বা বেহালা, একটু ভাবলেই বলে দিতে পারবে।

কেন এরকম লাগছে? গোটা ব্যাপারটাই তার কাছে জটিল ধাঁধার মতো। অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই মা-বাবার কাছে বাঙলাদেশ, বিশেষ করে কলকাতার অনেক গল্প শুনেছে সন্দীপ। কোন জায়গার গল্প শুনে কি মনে হয়, সে সেখানে থেকেছে? বঙ্গের কথাও বাবার কাছে কম শোনে নি সন্দীপ। কিন্তু কই, বঙ্গের কোন ছবিই তো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে না কিংবা মনে হয় না সে কখনও সেখানে গেছে বা থেকেছে।

শুধুমাত্র কলকাতার ছবিটাই তার মাথায় নেই। একটা পুরনো আমলের বড় বড় থামওলা গথিক স্ট্রাকচারের তেতলা বাড়ি, প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সামনের দিকে ফুলের বাগান, লন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

পামগাছ, ঘরে ঘরে পুরনো আমলের খাট-আলমারি, ছাদের আল্‌সেতে অগুণতি গেরোবাজ পায়রাও চোখ বুজলে সে দেখতে পায়। আর দেখতে পায় জাপানী পুতুলের মতো মধ্যবয়সী এক মহিলাকে, মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে ছ'ফুট লম্বা জবরদস্ত চেহারার এক ভদ্রলোককে, তিরিশ বত্রিশ বছরের এক দুর্দান্ত চটপটে চাকরকে, একটা হিন্দুস্থানী ড্রাইভারকে, একটা রাঁধুনীকে, কুড়ি একুশ বছরের একটা দারুণ সুন্দর মেয়েকে এবং এই সঙ্গে আরো কয়েকজনকে।

ঐ বাড়ীটা এবং এইসব লোকজন এই শহরেরই। কিন্তু তারা কোথায় থাকে সে বলতে পারবে না। ছেলেবেলায় এইসব ছবি আরো অনেক স্পষ্ট ছিল। একুশ বাইশ বছরে সেগুলো খানিকটা ঝাপসা হয়ে গেছে।

হঠাৎ ট্যাক্সিওলার গলা শোনা গেল, 'সাব, যাদবপুর আ গিয়া—'

চমকে উঠল সন্দীপ, তারপর জানালার বাইরে তাকিয়ে তার পরিচিত ছবিটির সঙ্গে সব মিলিয়ে দেখতে লাগল। জায়গাটা অনেক বদলে গেছে যেন। তবু চিনতে খুব অসুবিধে হচ্ছে না। রাস্তায় একটা লোককে জিজ্ঞেস করতেই সে দেখিয়ে দিল, 'ডানদিকে আনোয়ার শা রোড ধরে যান। একটু গেলেই বাঁ ধারে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির হস্টেল।'

ট্যাক্সি সেদিকেই চলল।

ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে মালপত্র নিয়ে হস্টেলের অফিসে চলে এল সন্দীপ।

টেবল-চেয়ার-ফ্যান-আলমারি-ফোন দিয়ে সাজানো এই ঘরটিতে মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক জাবর কাটার মতো পান চিবিয়ে যাচ্ছেন। মাঝারি হাইট, গায়ের রঙ টকটকে, ভরাট গোল মুখ। পরনে পুরনো

স্টাইলে ধুতির তলায় ফুলশার্ট গুঁজে দেওয়া, শার্টটার হাতায় ডাবল কাফ। সন্দীপ লক্ষ করল, ভদ্রলোকের গলার বোতামটি পর্যন্ত আটকানো। মাঝখান দিয়ে সিঁথি। বাঁ হাতে একটা পানের বোঁটা ধরা আছে। সেটার ডগায় চুণ। নাকের ওপর রোল্ডগোল্ডের একটা বাইফোকাল চশমা ঝুলছে। বুকপকেটে রুপোর চেনে বাঁধা পকেট ঘড়ি। দেখেই টের পাওয়া যায় তিনি এখানকার অফিসার ইন.-চার্জ এবং খুবই স্নেহপ্রবণ টাইপের মানুষ।

সন্দীপকে দেখে জাবর কাটা বন্ধ হল ভদ্রলোকের। চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথেকে আগমন?'

সন্দীপ বলল, 'বেনারস।'

'নাম কি সন্দীপ দত্ত?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার টেলিগ্রাম আগেই পেয়েছি।'

সন্দীপ উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক ফের বললেন, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।' বলেই সরু করে জিভ বার করে পানের বোঁটার ডগা থেকে চুণ চেটে নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, 'আমার নাম রমানাথ মুখার্জি, হস্টেল অফিসের চার্জে আছি। যদি ফেলটেল করে কেটে না পড়, পাঁচ বছর এই প্যাসচার গ্রাউণ্ডে তোমাকে চরতে হবে এবং রোজ আমার শ্রীমুখ দর্শন করতে হবে। আমাকে রমাদা বলেই ডেকো।'

'আচ্ছা।' ঘাড় কাত করল সন্দীপ।

'পুব দিকের উইংগে হস্টেলের যে চারতলা বাড়িটা রয়েছে তার টপ ফ্লোরে তোমাকে ঘর দিয়েছি।' বলে রমানাথ আরো কিছু কিছু খবর দিলেন। ঘরটা বেশ বড় মাপের। সাউথ-ইস্ট ওপেন। তবে সেখানে একা থাকবে না সন্দীপ। আরো দু'জনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকতে হবে। ওদের একজন হল আর. শঙ্করণ, অন্ধ্র থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে এসেছে। আরেক জন বিকাশ

সেনগুপ্ত, নর্থ বেঙ্গলের ছেলে ; তার সাবজেক্ট হল ইলেকট্রনিকস এবং ইনস্ট্রুমেন্টেসন।

সন্দীপ বলল, 'ঠিক আছে।'

একটু ভেবে রমানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতায় আগে আর কখনও এসেছ ?'

'না।' বলেই সন্দীপের মনে পড়ে গেল, এ শহরে আগে না এলেও এখানকার গোটা টোপোগ্রাফিটা তার মুখস্থ। কোথায় কী আছে চোখ বুজে সে বলে দিতে পারবে।

রমানাথ বললেন, 'একেবারে আনকোরা !'

সন্দীপ উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসল।

রমানাথ বলতে লাগলেন, 'ভাল রেজাল্ট করার ইচ্ছা আছে ?'

সন্দীপ অবাক। সে কোন উত্তর দেবার আগেই রমানাথ আবার প্রশ্ন করলেন, 'বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কী রকম ?'

সন্দীপ একেবারে হকচকিয়ে গেল। বিপক্ষের বাঘা উকীল যে ভাবে উল্টোপাল্টা জেরা করে রমানাথের প্রশ্নগুলো সেই রকম। সে বলল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

রমানাথ বললেন 'পারলে না, কেমন ? বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। ক্যালকাটা খুব ভালো জায়গা, আবার টেরিফিক খারাপ জায়গা। ভাল হতে চাও তো সব ফেসিলিটি পাবে, আবার যদি জাহান্নামে যেতে চাও তার জন্য এসকেলেটারও এখানে পাতা রয়েছে। একবার গিয়ে চাপলেই হল। এখন কলকাতার কোন দিকটা বেছে নেবে সেটা তোমার ওপর ডিপেণ্ড করছে।'

রমানাথের কথাগুলো শুনতে বেশ মজা লাগছিল সন্দীপের। সে বলল, 'এর সঙ্গে বাবার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সম্পর্ক কী ?'

'ভাল হতে চাইলে খুব একটা নেই। তবে খারাপ হতে চাইলে আছে। তখন অনেক অনেক ক্যাশ দরকার।' চাকুম চুকুম করে পান চিবোতে চিবোতে বেল বাজালেন রমানাথ।

তক্ষুনি একটা বয় দৌড়ে এল। রমানাথ বললেন, 'বাবুর মালপত্র পুব দিকের বড় চার তলার আঠার নম্বর ঘরে দিয়ে আয়।' সন্দীপকে বললেন, 'ওর সঙ্গে যাও। পরে খাতায় ক'টা ঘর ফিল-আপ করে সই করে দিয়ে যেও।'

সন্দীপ জানে হস্টেলে থাকতে হলে কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সে জন্য একটা আণ্ডারটেকিং দেওয়া দরকার। তা ছাড়া কবে সে এখানে এল, কোন ঘরে সে আছে, সে সব ব্যাপারেও হস্টেলের রেজিস্টারে রেকর্ড করিয়ে সই দিতে হবে। সন্দীপ বলল, 'আচ্ছা—'

'কোনরকম অসুবিধা টসুবিধা হলে আমাকে জানিও।'

মাথা হেলিয়ে দিল সন্দীপ – জানাবে। তারপর বয়টার সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

মিনিট পনের বাদে পুব দিকের উইংয়ে এসে মোট চৌষট্টিটা সিঁড়ি ভেঙে চারতলার আঠার নম্বর ঘরে এসে ঢুকল সন্দীপ।

ঘরটা বেশ বড় মাপের। তিনদিকে তিনটে প্রকাণ্ড জানালার ধার ঘেঁসে তিনখানা সিঙ্গল-বেড খাটিয়া পাতা। মাথার দিকে একটা করে বেঁটে সাইজের আলমারি আর পড়াশোনার জন্য ছোট টেবল, চেয়ার ইত্যাদি।

দুটো খাটিয়া আগেই দখল হয়ে গেছে। সন্দীপ দেখল, তারই বয়সী দুটি ছেলে ওদের বিছানায় বসে আছে। একজনের মাঝারি হাইট, রোগা পাতালা চেহারা, লম্বাটে ধারাল মুখ, গোল চোখ, গায়ের কালো রঙে চকচকে বার্নিশ লাগানো। সাউথ ইণ্ডিয়ানদের চেহারাগুলো খুবই মার্কামারা। দেখামাত্রই চেনা গেল। এই ছেলেটা আর. শঙ্করণ না হয়ে যায় না। অন্য ছেলেটা বেশ লম্বা। ফর্সাও না, কালোও না। টান টান চেহারা, চওড়া কাঁধ, হাত দুটো জানু ছুঁই ছুঁই, ঈষৎ ভারী ঠোঁট। ছেলেটার সব আকর্ষণ তার চোখে। ভাসা ভাসা দুই চোখে ছেলেমানুষি একটু হাসি আর মজা মাখানো।

এ খুব সম্ভব বিকাশ।

সন্দীপ ঘরে ঢুকতেই টান টান চেহারার ছেলেটা উঠে দাঁড়াল। রগড়ের গলায় বলল, 'ডেফিনিটলি বানারসীবাবু?' বলে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

ছেলেটার হাসি চমৎকার। মনের ওপর তার আভা যেন স্নিগ্ধ রৌদ্রঝলকের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ছেলেটাকে দারুণ ভাল লেগে গেল সন্দীপের। বারানসী শব্দটাকে একটু ঘুরিয়ে যে ভঙ্গিতে সে 'বানারসী বাবু' বলল তাতে হেসেই ফেলল সন্দীপ। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ওয়েলকাম।'

ওধার থেকে কালো ছেলেটিও বলে উঠল, 'মোস্ট ওয়েলকাম। উই ওয়ের ওয়েটিং ফর ইউ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসল সন্দীপ।

টান টান চেহারার ছেলেটি এবার বলল, 'আলাপটা আগে সেরে ফেলি। আমি বিকাশ আর ও শঙ্করণ।' ইংরেজিতেই বলল সে। তার কারণটাও বোঝা গেল। শঙ্করণ নিশ্চই বাঙলা জানে না।

সন্দীপ জানালো হস্টেল অফিসের ইন-চার্জ রমানাথের কাছে বিকাশদের কথা সে শুনেছে।

বিকাশ এবার বলল, 'একসঙ্গে থাকব। আপনি টাপনি আমার মুখে আসে না। স্ট্রেট তুই করে বলব। আপত্তি আছে?'

সন্দীপ বলল, 'নো অবজেকসন।'

হস্টেলের সেই বয়টা মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখিয়ে বিকাশ বলল, 'ওকে আগে ছেড়ে দে। তারপর জমিয়ে কথাবার্তা হবে।'

সন্দীপ বয়টাকে নিয়ে ফাঁকা খাটিয়াটার কাছে গেল। বলল, 'এখানে আমার জিনিসগুলো রাখো।'

স্যুটকেশ হোল্ড-অল আর বাস্কেট নামিয়ে বয়টা চলে গেল।

সন্দীপ সেগুলো খুলে শার্ট ট্রাউজার্স পায়জামা বালিশ বেডকভার ব্রাশ পেস্ট ইত্যাদি বার করে ফেলল। বিকাশ এবং শঙ্করণ উঠে এসে নিখুঁত করে তার বিছানা পেতে দিল। সন্দীপ তার জামা টামা আলমারির ভেতর হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল, 'তোরা কবে এসেছিস ?'

'কাল।' বিকাশ বলতে লাগল, 'আমি এসেছি সকালে, শঙ্করণ সন্ধেবেলা।'

'সেসান আরম্ভ হয়ে গেছে ?'

'না। পরশু থেকে হবে। আমরা সবাই একটু অ্যাডভান্স এসে গেছি।'

জিনিসপত্র গুছনো টুছনো হয়ে গেলে সন্দীপ বলল, 'রাত্রে ট্রেনে ভাল ঘুম হয় নি। মাথাটা ধরে আছে। স্নান করে নিতে হবে।' বলে শেভিং বক্স, তোয়ালে, পরিষ্কার লুঙ্গি আর পাঞ্জাবী বার করতে লাগল।

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ, স্নানটা তাড়াতাড়ি করে নে। বারোটার মতো বাজে। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। তোর স্নান হলে একসঙ্গে খাব।'

'বাথরুমটা কোথায় ?'

'বাইরে। চল, দেখিয়ে দিই।'

ঘণ্টাখানেক বাদে নিচের ডাইনিং হল থেকে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সন্দীপরা নিজেদের ঘরে এসে যে যার বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল। শঙ্করণ বাঙলা না জানায় ইংরেজিতে কথা বলতে হচ্ছে।

একসময় বিকাশ শঙ্করণকে বলল, 'ছ্যাখ বাবা, মনে মনে এত ইংলিশ ট্রানশ্লেসন করা যায় না। তুই তাড়াতাড়ি বাংলাটা শিখে ফেল।'

শঙ্করণ বলল, 'সিওর। তোরা আমাকে শিখিয়ে দে।'

বিকাশ সন্দীপ একসঙ্গে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শঙ্করণ বলল, 'আমি ক্যালকাটায় প্রথম এলাম। তোরা আমাকে শহরটা একটু চিনিয়ে টিনিয়ে দিস।'

বিকাশ বলল, 'নর্থ বেঙ্গলে থাকলেও কলকাতা আমার কাছে অলমোস্ট আননোন জায়গা। ছেলেবেলায় দু-একবার মোটে এসেছি। তবে ওল্ড' বালিগঞ্জটা চিনে ফেলেছি। কাল ট্রেন থেকে নেমে ওখানে যেতে হয়েছিল।'

শঙ্করণ বলল, 'তা হলে সন্দীপ আমাদের ক্যালকাটা চেনাবার রেসপনসিবিলিটি নেবে। কী রে, নিবি তো?'

সন্দীপ বলল, 'আমিও তোদের মতোই এই সিটিতে স্ট্রেঞ্জার। এই প্রথম এখানে এলাম। তবে—'

'তবে কী?'

সন্দীপকে এবার অন্যমনস্ক দেখাল। সে বলল, 'কলকাতা আমার ঠিক অচেনা নয়।' সে যেন এই ঘরে নেই, অনেক দূর থেকে তার গলা ভেসে আসতে লাগল।

সন্দীপের কথা শেষ হবার আগেই দরজার কাছে কয়েক জনকে দেখা গেল। সবার সামনে যে রয়েছে তার বয়স কম করে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। মাথার সামনের দিকে টাক, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, পেটে চর্বির থাক। পরনে বাটিকের কাজ-করা সিল্কের লুঙ্গি এবং জালিকাটা গেঞ্জি। হাতে ফিল্টার-টিপ কিং সাইজ সিগারেট। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শঙ্করণ সন্দীপ এবং বিকাশকে দেখতে দেখতে বলল, 'ওয়ান টু থ্রী। আমাদের আস্তাবলে তা হলে তিনটি নতুন মাল ইমপোর্টেড হল। গুড, ভেরি গুড।' বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে বিকাশের চেয়ারটা দখল করল। তার সাঙ্গোপাঙ্গরাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। ওদের দু'জন শঙ্করণ আর সন্দীপের চেয়ারে বসল। বাকী দু'জন পড়ার টেবলে।

আচমকা এতগুলো ছেলেকে ঘরে আসতে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল সন্দীপরা। তারা যে যার বিছানায় উঠে বসল। খানিকটা ভয়ও হচ্ছিল তাদের। ইউনিভার্সিটি বা কলেজ হস্টেলে নানারকম র‍্যাগিংয়ের কথা জানা আছে ওদের। এরা সেরকম মতলব নিয়ে এসেছে কিনা কে জানে।

সন্দীপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা?'

বয়স্ক লোকটি হাতের সিগারেটটা গাঁজার কল্কের মত ধরে লম্বা একটা টান মারল। তারপর বলল, 'তোদের পর্যবেক্ষণ করতে এলাম।'

সন্দীপ উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল।

লোকটি আবার বলল, 'আমার নাম রণধীর মল্লিক। আমি এই হস্টেলের মোস্ট ইমপর্টান্ট ল্যাণ্ডমার্ক। ফাদার অফ থ্রি কিডস। দশ বছর ধরে কম্পারাটিভ লিটারেচারের ফাইনাল একজামিনেসনটা ড্রপ করে যাচ্ছি। আমার ইচ্ছা হোল লাইফ স্টুডেন্টই থেকে যাব। বুঝলি?' বলে এক চোখ বুজে হাসল।

সন্দীপরা হাঁ হয়ে রইল।

রণধীর সন্দীপদের মুখচোখের ভাব লক্ষ করতে করতে বলল, 'অবাক হয়ে গেছিস, তাই না? আরে বাবা, আমার ফাদার কলকাতায় আমার নামে তিনটে বাড়ি আর ফিফটি ফাইভ লাখসের ফিক্সড ডিপোজিট রেখে গেছে। পরীক্ষায় পাশ করার দরকারটা কী আমার? নে, এদের নামগুলো জেনে রাখ।' বলে নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে দিল, 'এ হল ধীরাপদ চৌধুরী, ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের লাস্ট ইয়ার—' নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের পরিচয় দিয়ে বলল, 'এরা চার বছর ধরে ফাইনালটা ড্রপ করে আমার অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে আছে। তারপর চাঁদ, তুমি কোত্থেকে উদয় হলে?' বলে বিকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল

বিকাশ বলল, 'নর্থ বেঙ্গল—জলপাইগুড়ি।'

'ফ্রম দা ল্যাণ্ড অফ টী। হায়ার সেকেণ্ডারি, না বি. এস. সি?'

'বি. এস. সি।'

'অনার্স ছিল?'

'ছিল। ফিজিক্সে। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি।'

'গুড। মাল-টাল খাস?'

বিকাশ চমকে উঠল। জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না-না, এ কী বলছেন!'

রণধীর এবার জিজ্ঞেস করল, 'এল. এস. ডি, ম্যানড্রেকস কি গাঁজা

দেওয়া বিড়ি ?'

'নো, নেভার।'

রণধীরকে যেন খানিকটা হতাশই দেখাল। একটু চিন্তা করে সে বলল, 'মেয়েছেলের ঝামেলা আছে ?'

বিকাশ বলল, 'আমাদের বাড়ি খুব পিউরিটান। এসব ভাবাও যায় না।'

এবার শঙ্করণের দিকে তাকাল রণধীর ; শুধলো, 'তুমি কোথাকার মাল বাবা ?'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো এধারে ওধারে তাকাতে লাগল শঙ্করণ। বলল, 'বেগ ইওর পারডন।'

বিকাশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও বাঙলা জানে না। ইংরেজীতে বলুন।'

অগত্যা প্রশ্নটা ইংরেজীতেই করতে হল। শঙ্করণ জানালো সে কোত্থেকে আসছে।

রণধীর চোখ বড় করে মজার ভঙ্গিতে বলল, 'ফ্রম দা ল্যাণ্ড অফ দোসা অ্যাণ্ড ইডলি !'

বিকাশের মতই শঙ্করণ জেরা করে করে রণধীর যা বার করল তা এই রকম। সে-ও হায়দ্রাবাদ থেকে বি. এস. সি পাশ করে এসেছে। ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সিগারেট খায় না, ড্রিংক করে না, কোনরকম ড্রাগ অ্যাডিকশান নেই।

এবার সন্দীপের পালা। তার রেকর্ডও দুই রুমমেটের মতোই ক্লীন।

সব শোনার পর চোখ কুঁচকে রণধীর তার বাহিনীকে বলল, 'বেনারস হায়দ্রাবাদ আর জলপাইগুড়ি তিনখানা আগমার্কা ব্রহ্মচারী পাঠিয়েছে।' বলেই আবার সন্দীপদের দিকে ফিরল, 'তা মালেরা, তপোবনে না গিয়ে এখানে এসে ভিড়লে কেন ?'

সন্দীপরা কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

রণধীর আবার বলল, 'তোরা এখানে লেখাপড়া করতে এসেছিস তো ?'

ঠিক এই প্রশ্নটাই রমানাথও করেছিল। সে কি এই রণধীরের কথা ভেবেই? সন্দীপরা তিনজনই একসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই।'

'জেনে খুশী হলাম।' বলে নিজের সঙ্গীদের দিকে ফিরল রণধীর, 'এই মালেদের দরজায় একটা কাগজ পেস্ট করে দিয়ে যাস। তাতে লেখা থাকবে, 'গুড বয়েজ, নট টু বী ডিসটার্বড।' দেখিস হস্টেলের কেউ যেন ওদের ওপর ঝামেলা না করে। চল্ এখন।' উঠতে উঠতে রণধীর সন্দীপদের বলল, 'যে গোল্লায় যেতে চায় আমি গাইড হয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিই। আর যে রীয়ালি পড়তে চায়, তার সঙ্গে ফুল কো-অপারেশন করি। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

তিনজনেই ঘাড় কাত করে সায় দিল—বুঝেছে।

রণধীর বলতে লাগল, 'কিন্তু চাঁদেরা, দু'দিন কলকাতায় থাকার পর যদি ফ্লাইং সসারের মত উড়তে চাও, এই হস্টেল থেকে হাই কিক মেরে উড়িয়ে দেব।' বলে আর দাঁড়াল না; সাঙ্গোপাঙ্গসুদ্ধ চলে গেল।

রণধীররা চলে যাবার পর বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। সবাই চুপচাপ বসে আছে।

একসময় সন্দীপই প্রথম কথা বলল, 'এরকম টাইপ আমার লাইফে আর কখনও দেখি নি।'

শঙ্করণ এবং বিকাশ বলল, 'আমরাও না।'

রণধীররা চলে যাবার পর সন্দীপরা আবার যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। শুয়ে শুয়েই বিকেল পর্যন্ত গল্প করে গেছে।

সন্দীপের ঘর থেকে জানলা দিয়ে তাকালে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর কিছু গাছপালা। তারও পরে অ্যাসফাল্টের ঝকঝকে রাস্তা।

রাস্তা পেরুলে গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রীসার্চ ইনস্টিটিউট আর প্রিন্টিং টেকনোলজির বিরাট বাড়িগুলো চোখে পড়ে।

এখন আর সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। আকাশের ঢালু গা বেয়ে সোনালী বলের মতো গড়াতে গড়াতে সেটা হস্টেল বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে নেমে গেছে।

রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতো। সামনের গাছগাছালির মাথায় পাখিরা অবিশ্রান্ত ডাকাডাকি করে যাচ্ছে। বড় রাস্তায় ঢলের মতো বাস মিনি এবং ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

এই সময় হস্টেলের একটা বয় সন্দীপদের চা দিয়ে গেল। কাপে আলতো করে চুমুক দিয়ে বিকাশ বলল, 'চা খেয়ে আমাকে একটু বেরুতে হবে। চল্ না, তোরাও ঘুরে আসবি।'

সেসান শুরু হতে এখনও একদিন বাকী। তার আগে পড়াশোনার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া বিকেলবেলা ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না সন্দীপের। সে বলল, 'ঠিক আছে, কোথায় যাবি?'

'ওল্ড বালিগঞ্জে। আমার এক রিলেটিভের বাড়ি।' বিকাশ বলতে লাগল, 'ওখানে আমার ছোট বোন আছে। ওকে ক'টা জিনিস কিনে দিয়ে আসতে হবে। তারপর খানিকটা ঘুরেটুরে ফিরে আসব।'

'তোর বোন তোর রিলেটিভের বাড়ি থাকে?'

'না। কাল আমার সঙ্গে জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে। প্রেসিডেন্সিতে বি-এ ক্লাসে ভর্তি হবে। যতদিন না মেয়েদের কোন হস্টেলে অ্যাকোমোডেসন পাচ্ছে, ঐ আত্মীয়র বাড়িতেই থাকবে।' বলে বিছানা থেকে নেমে পাজামা ছেড়ে ট্রাউজার্স শার্ট পরে ফেলল।

সন্দীপ আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে-ও পোশাক-টোশাক বদলাতে লাগল। কিন্তু শঙ্করণ তার বিছানাতেই শুয়ে রইল। সে বলল, 'আমি আজ আর বেরুব না। ট্রেনে ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিল। সারা শরীর ব্যথা হয়ে আছে। তোরা ঘুরে আয়।'

খানিকটা পর সন্দীপ আর বিকাশ হস্টেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায়

চলে এল। বিকাশ বলল, 'ওল্ড বালিগঞ্জ এখান থেকে খুব দূরে না। হাঁটতে হাঁটতে যাবি, না ট্যাক্সি ফ্যাক্সি নেব?'

দক্ষিণ দিক থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে আসছে। শরতের সুখ-দায়ক ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে মেখে খানিকক্ষণ হাঁটতে ভালই লাগবে। সন্দীপ বলল, 'না না, হেঁটেই যাব।'

চওড়া ফুটপাথ দিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। হাঁটতে হাঁটতে যোধপুর পার্ক, ঢাকুরিয়া পার হয়ে ওরা গড়িয়াহাট ওভার ব্রিজের ওপর চলে এলো। নিচে রেল লাইন। দেখতে দেখতে সন্দীপের মনে হলো, এ সবই তার চেনা। মাথার ভেতর যে ছবিটা আছে সেটার সঙ্গে এ সব জায়গার প্রচুর মিল। তফাতের মধ্যে রাস্তাঘাট অনেক চওড়া হয়েছে, চারদিকে অজস্র হাই-রাইজ বিল্ডিং উঠেছে, প্রাইভেট কার-ট্যাক্সি-বাস বহুগুণ বেড়েছে। নিচের রেল লাইনটা যেন কোথায় গেছে? একটু চিন্তা করতেই মনে হলো—একদিকে শিয়ালদা, আর একদিকে বজবজ। মনে হলো, এ লাইনের ট্রেনে উঠে অনেক বার সে বজবজ গেছে। কেন এরকম মনে হচ্ছে?

পাশাপাশি চলতে চলতে অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল বিকাশ। ছোট বোনকে নিয়ে কাল একবার প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে হবে; কোন মেয়ে হস্টেলে তাকে রাখতে হবে। যাদবপুরে সেসান শুরু হলে নিজের পড়াশোনার ওপর জোর দিতে হবে। যে ভাবেই হোক ভাল রেজাল্ট করা চাই-ই। ইত্যাদি ইত্যাদি···

সন্দীপের মনে হচ্ছিল, পাশ থেকে নয়, অনেক দূর থেকে বিকাশের গলা ভেসে আসছে। চারপাশের বাড়িঘর রাস্তা লোকজন দেখতে দেখতে দূরমনস্কর মতো হুঁ হুঁ করে যাচ্ছিল সন্দীপ।

আরো খানিকটা পর গোলপার্ক ছাড়িয়ে দু'জনে গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে পড়ল। উল্টোদিকে মুখোমুখি প্রকাণ্ড ছুটো বাড়ি, নিচে ট্রাম লাইন—সব, সব তার চেনা। ডানদিকে আঙুল বাড়িয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'ঐ রাস্তাটা বালিগঞ্জ স্টেশনে চলে গেছে, তাই না রে?'

বিকাশ বলল, 'আমি ঠিক জানি না।'

সন্দীপ এবার বলল, 'ওল্ড বালিগঞ্জে যেতে হলে রাস্তা ক্রশ করে সামনের দিকে যেতে হবে, তা-ই তো?'

বিকাশ কয়েক পলক সন্দীপের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর অবাক বিস্ময়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কী?'

'তুই জানলি কী করে?'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

রাস্তা পেরিয়ে ওরা ওপারে চলে গেল। একটা দোকান থেকে তোয়ালে ক্রিম পাউডার এমনি টুকিটাকি ক'টা জিনিস কিনল বিকাশ। তারপর গড়িয়াহাটা ক্রসিং এবং কিছু দূরে ট্রাম ডিপো পেছনে ফেলে ডাইনে ঘুরল। মাথার ভেতরকার সেই ছবিটার সঙ্গে সামনের রাস্তাটা ভীষণ মিলে যাচ্ছে। সন্দীপ বলল, 'এই রাস্তাটা সুইনহো স্ট্রীট না?'

বিকাশ বলল, 'হ্যাঁ। তুই জানলি কি করে?' তার বিস্ময় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে যেন।

এবারও সন্দীপ কোন উত্তর দিল না।

সুইন হো স্ট্রিট ধরে বাঁয়ে এবং ডাইনে খানিকটা যাবার পর একটা রাস্তার মোড়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল সন্দীপ। রাস্তাটা এখানে ডান দিকে ঘুরে গেছে। এখানকার রাস্তাঘাট বাড়িটাড়ি তার খুবই পরিচিত। মনের অতল স্তরে পুরনো স্মৃতির ওপর যেন বহুকালের ধুলোবালি জমে ছিল। আচমকা সব জঞ্জাল সরিয়ে স্মৃতিটা লাফ দিয়ে কোন মরচে ধরা কিংখাবের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। আগে সে তো কোনদিন এখানে আসে নি। তবে কেন সব কিছু এত চেনা মনে হচ্ছে? রুদ্ধশ্বাসে সে বিকাশকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ডানদিকের রাস্তার সামনে কি একটা ধোবিখানা আছে?'

বিকাশ হাঁ হয়ে গেল, 'হ্যাঁ আছে।'

'তারপর একটা মিষ্টির দোকান? ভুজঙ্গ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার—'

'নাম মনে নেই। তবে একটা মিষ্টির দোকান আছে।'

'মিষ্টির দোকানের পর কি একটা একতলা বাড়ি?'

'হ্যাঁ।' সন্দীপ যেন পর পর অবিশ্বাস্য কিছু ম্যাজিক দেখাচ্ছে, এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে বিকাশ।

সন্দীপ তাকে লক্ষ্য করে না। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে বলে যায়, 'তারপর প্রকাণ্ড কমপাউণ্ড-ওলা পুরনো আমলের তেতলা বিল্ডিং। মোটা মোটা থাম—'

বিকাশের বিস্ময় আচমকা একশো গুণ বেড়ে গেল। সন্দীপের দিকে ঝুঁকে বলল, 'কারেক্ট কারেক্ট। ঐ থামওলা প্রকাণ্ড বিল্ডিংটাই আমার রিলেটিভের বাড়ি। আমরা সেখানেই যাচ্ছি। কিন্তু—'

অন্যমনস্কর মতো সন্দীপ সাড়া দিল, 'কী?'

'তুই এসব জানলি কী করে? তখন যে বললি কলকাতায় আসিস নি। ডেফিনিটলি তুই অনেকবার এখানে এসেছিস। পারটি-কুলারলি এই জায়গাটায়।'

'বিশ্বাস কর, লাইফে এই প্রথম কলকাতায় এলাম।'

'তা হলে এত ডিটেলে কী করে বলতে পারছিস?'

'কী জানি।'

অদ্ভুত চোখে সন্দীপকে দেখতে দেখতে বিকাশ বলল, 'ঠিক আছে, এখন চল্—'

ডানদিকের মোড় ঘুরে ধোবিখানা, মিষ্টির দোকান এবং একতলা একটা বাড়ি পেরিয়ে বিরাট কম্পাউণ্ড-ওলা গথিক স্ট্রাকচারের প্রকাণ্ড এক লোহার গেটে এসে দাঁড়াল বিকাশরা। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মাথার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল সন্দীপের। টের পেল বুকের ভেতর হৃদ্‌পিণ্ডটা ঝড়ের বেগে ওঠানামা করছে।

একটা দারোয়ান গেট খুলে দিল।

বিকাশ ডাকল, 'আয়—'

আচ্ছন্নের মতো বিকাশের পেছন পেছন বাড়ির ভেতরে ঢুকল

সন্দীপ। ঢুকেই বাঁ দিকে ফুলের বাগান, ডানদিকে সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের লন। বাগান এবং লনের মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা বিরাট বিরাট থামওলা প্রকাণ্ড বারান্দায় গিয়ে মিশেছে। রাস্তাটার ছ'ধারে মোটা পামগাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। এই মুহূর্তে বাগানে একটা মালী বড় কাঁচি দিয়ে গোলাপ গাছের পাতা ছাঁটছে।

সেই ছোটবেলা থেকে অবিকল এই বাড়িটা সিনেমা স্লাইডের মতো সন্দীপের চোখের সামনে কতবার যে ভেসে উঠেছে তার হিসেব নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে সে শুধু দেখেই যাচ্ছে। চোখের পাতা আর পড়ছে না। যে বাড়িটা এতকাল মনের ভেতর বার বার ফুটে উঠেছে সেটা যে সত্যি সত্যিই কোনদিন দেখতে পাবে, তা ছিল তার কল্পনার বাইরে।

নুড়ির রাস্তার মাঝামাঝি আসতেই ভারী গলার স্বর ভেসে এল, 'বিকাশ—'

ঘাড় ফেরাতেই দেখা গেল, ডান দিকের গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বেতের গোলাকার ফ্যাশনেবল্ চেয়ারে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। এই বয়সেও বসার ভঙ্গিটি সটান। মেরুদণ্ড এখনও বেঁকে যায় নি। তবে চুলের আশী ভাগই সাদা হয়ে গেছে; সামনের দিকে টাকও দেখা যাচ্ছে। চওড়া কাঁধ; ভাল বাংলায় একেই বোধহয় বৃষস্কন্ধ বলা হয়। হাত পায়ের হাড় মোটা মোটা। পরনে ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি। হাতে মোটা সিগার। গার্ডেন আমব্রেলার শেডের জন্য শরতের এই শেষ বেলায় ভদ্রলোকের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু সন্দীপের মনে হলো, এই মানুষটি তার চেনা, ভীষণ চেনা। পলকহীন সে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক বললেন, 'লনে বসবি, না বাড়ির ভেতরে যাবি?'

বিকাশ বলল, 'আপনি যা বলেন—'

একটু কি ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর চেয়ার থেকে উঠে পড়তে পড়তে বললেন, 'সন্ধে হয়ে আসছে। চল্ ভেতরে গিয়েই বসি।'

বলতে বলতে গার্ডেন আমব্রেলার তলা থেকে বেরিয়ে সোজা বিকাশদের কাছে এলেন।

এবার চমকে উঠল সন্দীপ। ছেলেবেলা থেকে সিনেমা স্লাইডের মতো যাদের ছবি অনবরত দেখেছে, ঐ মানুষটি তাদের মধ্যে রয়েছেন। তবে ঠিক এই মানুষটিই নন ; ওঁর বয়স থেকে কুড়ি বাইশ বছর কমিয়ে দিলে যা দাঁড়ায়—তাঁকে।

ভদ্রলোক আগে সন্দীপকে লক্ষ্য করেন নি। এবার এক পলক তাকে দেখে বললেন, 'ছেলেটি কে ?'

'আমার বন্ধু। হস্টেলে আমরা একই রুমে আছি।'

'কি রকম ছেলে তুই ! বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না ?'

ভদ্রলোককে সন্দীপের নাম টাম জানিয়ে বিকাশ সন্দীপের দিকে ফিরল, 'ইনি আমার মেসোমশাই—শ্রীঅমরনাথ দাশগুপ্ত ; রিটায়ার্ড সি-বি-আই অফিসার।'

সন্দীপ নীচু হয়ে অমরনাথকে প্রণাম করল। দু হাতে তাকে পায়ের কাছ থেকে তুলে নিয়ে অমরনাথ বললেন, 'তুমি কি বিকাশের মতো ইলেকট্রনিক্স আর ইনস্ট্রুমেণ্টেস্‌নে ভর্তি হয়েছে ?'

সন্দীপ বলল, 'আজ্ঞে না, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ।'

'ভাল। মেকানিক্যালেরও যথেষ্ট ডিমাণ্ড। দেশে নানা রকম প্রোজেক্ট হচ্ছে। সব লাইনের ইঞ্জিনীয়ার দরকার।' বলতে বলতে অমরনাথের খেয়াল হলো, তাঁরা নুড়ির রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে আছেন। একটু ব্যস্তভাবে এবার বললেন, 'চল—'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে এলোমেলো দু-একটা কথা হল। কোন কলেজ থেকে সন্দীপ পাশ করেছে, বি. এস-সি'তে কিরকম রেজাল্ট হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দীপ অমরনাথের কথার উত্তর দিচ্ছে ঠিকই, তবে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েই রয়েছে।

একসময় নুড়ির রাস্তা পার হয়ে সবাই লম্বা লম্বা সিঁড়ি ভেঙে

থামওলা বিরাট বারান্দায় উঠে এল। বারান্দা পেরুলেই ডানদিকের প্রকাণ্ড ঘরটা ড্রইং রুম। সেখানে ঢুকে অমরনাথ বিকাশদের বললেন, 'বোস্—' তারপর গলা তুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'নরহরি—নরহরি—'

কোত্থেকে তক্ষুনি একটা নাকী সুর ভেসে এল, 'যাই আজ্ঞা—' এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যবয়সী একটা লোক ডান দিকের দরজা দিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকল।

লোকটা অর্থাৎ নরহরিকে দেখে আরেক বার চমক লাগল সন্দীপের। বেঁটে খাটো চেহারা নরহরির, কালো রঙ, এবড়ো খেবড়ো মুখ, ট্যারাবাঁকা দাঁত, ঈষৎ কুঁজো পিঠ, ইঞ্চিখানেক গর্তে ঢোকানো চোখ, উঁচু কপাল, গায়ে এক গ্রামও বাজে চর্বি নেই। চুল বেশির ভাগই কাঁচা, গালে আলপিনের মতো দাড়ি, পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া।

ছেলেবেলা থেকে যে সব বাড়িঘর আর লোকজনের ছবি সে হঠাৎ হঠাৎ দেখে আসছে নরহরিও তাদের মধ্যে আছে। তফাতের মধ্যে যে-নরহরির ছবি সে দেখতে পায় সে ছিল যুবক। আর অমরনাথদের এই ড্রইং রুমে দশ ফুট দূরে যে নরহরি দাঁড়িয়ে আছে সে প্রৌঢ়। যুবক নরহরির বয়সটা হঠাৎ বাইশ চব্বিশ বছর বেড়ে গেলে যা দাঁড়ায় তা হল এই নরহরি। আশ্চর্য, ছবির সেই মানুষজন বাড়িঘর কোন দিন যে রীয়াল হয়ে উঠবে, সন্দীপ ভাবতে পারেনি।

অমরনাথ বললেন, 'তোর মা আর সোনালী দিদিমণিকে খবর দে। বলবি, বিকাশ আর তার এক বন্ধু এসেছে।'

বিশাল ড্রইং রুমের এক ধারে দোতলায় যাবার ঘোরানো সিঁড়ি। নরহরি খানিকটা ঝুঁকে ঝুঁকে কাঠবেড়ালির মতো তর তর করে ওপরে উঠে গেল।

সন্দীপের মনে পড়ল, যুবক নরহরি ঝুঁকে ঝুঁকে হাঁটত। এই মধ্যবয়সী নরহরিরও সেই একই অভ্যাস।

সিঁড়ির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ড্রইং রুমটা দেখতে লাগল সন্দীপ।

ডিসটেম্পার-করা পুরু দেয়ালে নানা রকম অয়েল পেন্টিং ঝুলছে। আর রয়েছে সুদৃশ্য সব র‍্যাক এবং আলমারিতে বিভিন্ন বিষয়ের বই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন, নানা দেশের ইতিহাস ছাড়া রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্পর্কে অসংখ্য মোটা মোটা বই। আর আছে এনসাইক্লোপেডিয়া, বিখ্যাত শিল্পী-কবি-বিজ্ঞানী এবং ফিল্ম পার্সোনালিটি-দের অটোবায়োগ্রাফি। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির অগুণতি ম্যাগাজিনও যত্ন করে একটা আলমারিতে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব বই-টই শুধু যদি ঘর সাজাবার জন্য কেনা না হয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে অমরনাথঁদের ফ্যামিলি খুবই কালচার্ড।

চারদিক দেখতে দেখতে সন্দীপের মনে হতে লাগল, এই ঘরটাও তার চেনা ; দেওয়ালের ঐ সব অয়েল পেন্টিং, বইয়ের আলমারি আগেই দেখেছে সে। অমরনাথ আর বিকাশ পাঁচ গজ দূরে বসে কী সব কথাবার্তা বলছে। কিন্তু কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছে না সন্দীপ। অস্পষ্টভাবে তাদের কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছে শুধু। আসলে দূরমনস্কর মতো এই বাড়ি, ড্রইং রুম, নরহরি, অমরনাথ এবং ছেলেবেলা থেকে দেখে আসা সিনেমা স্লাইডের মতো সেই ছবিগুলির কথাই ভাবছিল সে।

সন্দীপের চোখ দুটো চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে চমৎকার একটা টেবলের ওপর আটকে গেল। ওখানে স্টীলের ফ্রেমে বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবকের ছবি দাঁড় করানো রয়েছে। ছবিটার গলায় একটা টাটকা রজনীগন্ধার মালা, নিচে ধূপদানিতে একগোছা সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বলছে। মনে হয়, অল্প কিছুক্ষণ আগে কেউ ছবিটাতে মালা পরিয়ে ধূপকাঠিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। ফুল এবং ধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস ম ম করছে।

ছবিটার দিকে তাকিয়েই সন্দীপের মনে হলো, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা যেন থমকে গেল। এই যুবকটিও তার ভীষণ চেনা। দেখতে দেখতে মেন লাইনের ছোট্ট স্টেশন পলাশপুরের একটা ভয়াবহ দৃশ্য চোখের

সামনে ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু ছবিটা স্পষ্ট হবার আগেই বিকাশের গলা কানে এলো, 'এই সন্দীপ, সন্দীপ—'

হকচকিয়ে ঘাড় ফেরাতেই সন্দীপ দেখতে পেল, একজন বয়স্কা মহিলা এবং আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে খানিকটা দূরে পাশাপাশি বসে আছে। মেয়েটির গায়ের রঙ আশ্বিনের রৌদ্রঝলকের মতো। মসৃণ ত্বক, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে কোঁচকানো চুলের ঘের, পাতলা নাকের ছ'পাশে কালো পালকে ঘেরা ভাসা চোখ। নিটোল গলায় এতটুকু ভাঁজ নেই। সমস্ত শরীর তার মোম দিয়ে গড়া যেন। পরনে ময়ূর ছাপ দেওয়া সিল্কের শাড়ি আর মেরুন রঙের ব্লাউজ, পায়ে হাল্কা ফোমের চটি। আর মহিলাটি সন্দীপের খুবই পরিচিত। বহুবার দেখা অবিকল গোলগাল সেই জাপানী পুতুলটি। তফাতের মধ্যে চুলের বেশির ভাগই সাদা হয়ে গেছে। সমস্ত চেহারায় মলিন একটা ছাপ, চোখ বিষণ্ণ। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। ওঁরা যে কখন ড্রইং রুমে এসে বসেছেন, সন্দীপ টের পায়নি।

বিকাশ বলল, 'কী ভাবছিলি ?'

সন্দীপ লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ নামিয়ে বলল, 'কী আবার ভাবব !'

অমরনাথ সন্দীপকে দেখিয়ে বয়স্ক মহিলাটিকে বললেন, 'মমতা, এই ছেলেটি বিকাশের বন্ধু, ওর নাম সন্দীপ। ক্যালকাটায় আসার পর সন্দীপই ওর ফার্স্ট ফ্রেণ্ড।' বলে বিকাশের দিকে তাকালেন, 'তাই তো ?'

বিকাশ বলল, 'না মেসোমশাই। সন্দীপের আগে আরেকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। অন্ধ্রের ছেলে, নাম শঙ্করণ।'

'ছটো দিন কাটতে না কাটতে এক জোড়া ফ্রেণ্ড যোগাড় করে ফেললি ! এই রেটে বন্ধু জুটলে পড়াশোনার বারোটা বাজবে।'

'কী করব, শঙ্করণও আমার রুমমেট যে। তা ছাড়া ও খুব ভাল ছেলে।'

'ঠিক আছে। বন্ধু জোটানোর ব্যাপারটায় এবার ফুলস্টপ দিয়ে দে।'

বিকাশ ঘাড় হেলিয়ে দিল।

এবার অমরনাথ সন্দীপের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন : বয়স্কা মহিলাটি অর্থাৎ মমতা তাঁর স্ত্রী আর, মেয়েটি অর্থাৎ সোনালী বিকাশের ছোট বোন।

সন্দীপ আগেই তা আন্দাজ করেছিল। সে উঠে গিয়ে মমতাকে প্রণাম করল। মমতা তার থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা—'

প্রণামের পর সন্দীপ তার সোফায় ফিরে আসতে যাবে, সোনালী উঠে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। একেবারে কুঁকড়ে গেল সে, লাফ দিয়ে তিন পা-পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'এ কী, এ কী—'

মমতা হাসলেন, 'সোনা তোমার চাইতে ছোট। প্রণাম করলে কিছু দোষ হয় না।'

বিব্রত সন্দীপ কোন রকমে বলতে পারল, 'না মানে—'এই পর্যন্ত বলেই নিজের সোফায় এসে ফের বসে পড়ল।

মমতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের বাড়ি কোথায় ?'

'বেনারসে।'

অমরনাথ এই সময় বলে উঠলেন, 'তবে যে তখন বললে এলাহাবাদ থেকে বি. এসসি পাশ করেছে !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ক্লাস ফোর থেকে বি. এসসি পর্যন্ত আমি এলাহাবাদে পড়েছি।' সন্দীপ বলল, 'ওখানে হস্টেলে থাকতাম। ছুটিতে বেনারস আসতাম।'

'ইউ-পিতে থেকে এত সুন্দর বাঙলা বলতে শিখলে কী করে ? প্রোনানসিয়াসনে এতটুকু জড়তা নেই।'

'বেনারস তো এক রকম বাঙালীদেরই শহর। এলাহাবাদেও প্রচুর বাঙালী। আমরা বাড়িতে বাঙলা বলি। স্কুল কলেজে বাঙলা পড়েছি—' কথা বলতে বলতে অনবরত অস্থিরভাবে মমতা, অমরনাথ আর এই ড্রইং রুম দেখে যাচ্ছে সন্দীপ।

মমতা এবার বললেন, 'তোমরা ক' ভাই বোন ?'

'দুই ভাই। বোন নেই।'

'তুমি?'

'আমি ছোট। দাদা স্টেট ব্যাঙ্কে জুনিয়ার অফিসার। দিল্লীতে আছে।'

'মা-বাবা আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কত দিন তোমরা বেনারসে আছ?'

'অনেক দিন। বাবার কাছে শুনেছি, প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর। আমার জন্ম ওখানে।'

'বাংলাদেশে তোমাদের কেউ নেই?'

'আমি ঠিক জানি না। মা-বাবার কাছে শুনেছি আমাদের খুব বেশি আত্মীয় স্বজন নেই। যা দু-চারজন আছে, সবই বিহার কি ইউ-পিতে।'

সন্দীপের সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছিল মমতার। এ শহরে তার কেউ নেই জেনে বললেন, 'তোমার যখন ইচ্ছা হবে, আমাদের বাড়ি চলে এসো।'

সন্দীপ মাথা নাড়ল।

এদিকে সোনালীর ভর্তির ব্যাপার নিয়ে বিকাশ আর অমরনাথের মধ্যে কথা হচ্ছিল। অমরনাথ বললেন, 'এ নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি কাল নিজে ওকে প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে আসব। ও যা রেজাল্ট করেছে তাতে কিছু অসুবিধা হবে না।' একটু থেমে বললেন, 'প্রেসিডেন্সির ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আমার ছোট ভাইয়ের মতো। তাকে আমি ফোনও করে রেখেছি।'

বিকাশ বলল, 'তা হলে কাল আমার আসার দরকার নেই?'

'বললাম তো। এ ব্যাপারটা নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। লিভ ইট টু মী।'

'কিন্তু হস্টেলের ব্যাপারটা?'

ভুরু কুঁচকে অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের হস্টেল?'

অমরনাথের তাকানোটা এমন যে ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগল বিকাশ। চোখ নামিয়ে বলল, 'মানে ঐ সোনার জন্যে—'

হাতের সিগার নিভে গিয়েছিল অমরনাথের। লাইটার জ্বেলে সেটা ফের ধরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েদের হস্টেলে থাকা আমি পছন্দ করি না। ও এখন এখান থেকেই ক্লাশ করবে।'

দ্বিধান্বিতভাবে এবং ভয়ে ভয়ে বিকাশ বলল, 'কিন্তু বাবা বলে দিয়েছিলেন—'

অমরনাথ বললেন, 'তোর বাবাকে ট্রাঙ্ককলে বলে দেব'খন; এতে কোন অবলিগেসনে ফেলা হবে না। বরং মেয়েটা থাকলে আমরা বেঁচে যাব।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'তোর মাসিমা আর আমি মীন্‌স তুই যক্ষ আর যক্ষিণী এত বড় বাড়ি আগলাচ্ছি। লাইফ লস্ট অল দা চার্মস টু আস। নেহাত সুইসাইডটা করতে পারি না, তাই কোন রকমে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি। আর—'

এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেলেন অমরনাথ। তাঁর বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস অনেকগুলো স্তর ঠেলে উঠে এলো যেন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। এত বড় ড্রইং রুমটার চারধারে কী এক বিষাদ যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিকাশ বলল, 'বাবাকে তা হলে সোনার ব্যাপারে আমি কিছু জানাব না?'

'নো-নো-নো। বললামই তো, তোর বাবাকে ফোন আমিই করব। যা জানাবার আমিই জানিয়ে দেব। তোমার পাকামো করার দরকার নেই।'

মমতাও বললেন, 'সোনা এখানেই থাক। সারাদিন মুখ বুজে বোবা হয়ে বসে থাকি। ওকে পেলে দুটো কথা বলে বাঁচব।'

সন্দীপ কিছুক্ষণ অমরনাথের কথা শুনছিল। তারপর কখন যে তার চোখ দুটো স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো সেই যুবকের ছবির ওপর আটকে গেছে, নিজেই জানে না। ছবিটা দেখতে দেখতে আচমকা চাপা গলায় সে বলে উঠল, 'এ কে?'

ঘরের সবগুলো চোখ সন্দীপের দিকে ঘুরে গেল। বিষণ্ণ গলায় অমরনাথ বললেন, 'আমার একমাত্র ছেলে।' একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'তেইশ বছর আগে ও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

মমতা ঝাপসা গলায় ওধারের সোফা থেকে বলে উঠলেন, 'সেই থেকে আমাদের এত বড় বাড়ি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে।'

ফটোটার দিক থেকে চোখ ফেরায়নি সন্দীপ, প্রচণ্ড জোরে অর্কেস্ট্রা বাজলে যে রকম শব্দ হয় তার বুকের ভেতর সেই রকম কিছু একটা হচ্ছে। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, আচ্ছা, এর নাম কী ছিল—জয়ন্ত ?'

গোটা ড্রইং রুমটায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা নেমে এলো। তারপর অমরনাথের গলাই প্রথম শোনা গেল, 'তুমি—তুমি জানলে কী করে?' তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং চোখে-মুখে একই সঙ্গে বিস্ময় এবং বিমূঢ়তা।

আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল সন্দীপ। দেখল, মমতা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঘরের অন্য সবার চোখও তার দিকেই স্থির হয়ে আছে।

অমরনাথ এবার সন্দীপের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বয়েস কত ?'

সন্দীপ বলল, 'সবে একুশে পড়েছি।'

'আমার ছেলে জয়ন্ত তেইশ বছর নেই। তোমার জন্মের দু'বছর আগে ওর মৃত্যু হয়েছে। তার মানে জয়ন্তকে দেখা বা তার সঙ্গে তোমার আলাপ হওয়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। ওর নামটা তুমি জানলে কী করে ?'

'বলতে পারব না। ছবিটা দেখতে দেখতে মনে হল।'

'স্ট্রেঞ্জ—'

এই সময় একটা বুড়ো মতো লোক প্রকাণ্ড একটা ট্রে-তে করে প্রচুর খাবার দাবার আর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো। সেণ্টার টেবলে ট্রেটা নামিয়ে লোকটা চলে যাবে, বিদ্যুৎচমকের মত সন্দীপের কী

মনে পড়ে গেল। সে লোকটাকে বলল, 'যুধিষ্ঠিরদা না?'

লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। কাঁচাপাকা ভুরু দুটো ওপর নিচে তুলে কয়েক পলক সন্দীপের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি আমাকে চেনো নাকি। আমি কিন্তু তোমাকে আগে দেখি নাই।'

ঘরের অন্য সবাইও চমকে গেছে। আগে যে কখনও এখানে আসেনি, কী করে সে এ বাড়ির কাজের লোকের নাম জানতে পারে? অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি যুধিষ্ঠিরকে চিনলে কী করে? আগে কোথাও দেখেছ?'

সন্দীপ বলল, আজ্ঞে না। কলকাতায় তো আজই প্রথম এলাম। দেখব কোত্থেকে?'

অমরনাথ এবার বিকাশের দিকে ফিরলেন, 'তুই কী সন্দীপকে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে কিছু বলেছিস?'

বিকাশ বলল, 'কী বলব?'

'এই ধর, এখানে কে কে আছে, তাদের নাম, চেহারার ডেসক্রুপসান —এই সব?'

'না, তেমন কোন কথাই হয়নি। শুধু বলেছিলাম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি যাব, তুই সঙ্গে চল। ব্যস—'

অমরনাথ বললেন, 'আশ্চর্য তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অমরনাথকে থামিয়ে দিয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল বিকাশ, 'জানেন মেসোমশাই, দারুণ একটা ব্যাপার হয়েছে—'

'কী?'

'আমরা যখন সুইনহো ষ্ট্রীট থেকে এই রাস্তার মোড়ের কাছে এসেছি তখন আচমকা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সন্দীপ। তারপর টকাটক বলতে শুরু করেছিল, এই রাস্তায় ঢুকলে প্রথমে ধোবিখানা, তারপর মিষ্টির দোকান, তারপর একতলা একটা বাড়ি, তারপর আপনাদের এই বাড়িটা—'

'রাস্তায় না ঢুকেই বলে যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

বিমূঢ়ের মতো অমরনাথ বলতে লাগলেন, 'যে কখনও এখানে আসেনি সে কেমন করে এত সব ডিটেল বলতে পারে? তা ছাড়া জয়ন্ত আর যুধিষ্ঠিরের নাম বলা? সেটাও তো একটা দুর্দান্ত ব্যাপার। এ রকম 'পাওয়ার' আগে আর কখনও কারো দেখিনি।' বলে সন্দীপের দিকে আরো অনেকটা ঝুঁকে পড়লেন অমরনাথ, 'কী করে এ সব বলতে পারলে? তুমি কি কোন রকম ওকাল্ট সায়েন্সের চর্চা কর?'

ওকাল্ট সায়েন্স ব্যাপারটা বুঝতে পারল না সন্দীপ। জিজ্ঞেস করল, 'মানে?'

'মানে গুপ্তবিদ্যা। যেমন জ্যোতিষ, ভূতপ্রেত সম্বন্ধে স্টাডি, এটসেট্রা।'

'না-না, আমি ও সব কিছু জানি না। এখানে আসতে আসতে হঠাৎ কেন যেন মনে হল, এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। ঐ মিষ্টির দোকান, ধোবিখানা, আপনাদের বাড়ি।' জয়ন্তর ফোটো আর যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়ে বলল, 'এদের দেখে ঐ নাম দুটো মনে হল, বলে ফেললাম। মিলে গেল।'

'হুঁ—'আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসলেন অমরনাথ। তারপর সোফায় হেলান দিলেন। এ রকম ব্যাপার আগে আর কখনও ছাখেননি, শোনেননি। অস্পষ্টভাবে তিনি বিড় বিড় করলেন, 'অদ্ভুত অদ্ভুত—'

সোনালী এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে সন্দীপ সম্পর্কে সে দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এমনিতে সে খুবই স্মার্ট এবং ঝকঝকে মেয়ে। তার মধ্যে কোথাও বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা নেই। সহজ গলায় এবার সে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব সন্দীপদা?'

সন্দীপ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

'আগে না দেখেও, না জেনেও অনেক কিছু বলেছেন। এই বাড়িটা সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারেন?'

এ বাড়ির কোন্ ফ্লোরে ক'টা ঘর, ক'টা বাথরুম, কোথায় কী আছে, যাবতীয় খুঁটিনাটি চোখ বুজে সে বলে দিতে পারে। ছেলেবেলা থেকে এখানকার ছবি কতবার যে সে দেখেছে তার হিসেব নেই। তার চোখ চকচকিয়ে উঠল। কিন্তু বলতে গিয়ে সে থেমে গেল। লক্ষ্য করল, ঘরের প্রতিটি মানুষ যেন রুদ্ধশ্বাসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কেন যেন সন্দীপের মনে হলো, প্রথম দিনেই আর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'এখন আর কিছু মনে হচ্ছে না। পরে মনে হলে বলব।'

চা এবং খাবার ট্রেতে পড়েই ছিল। হঠাৎ মমতার চোখ সেদিকে গেল। ব্যস্তভাবে প্লেটে প্লেটে খাবার সাজিয়ে সবাইকে দিলেন। তারপর কাপে কাপে লিকার-দুধ-চিনি দিয়ে চা তৈরি করতে লাগলেন।

খেতে খেতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। এবার বিকাশ বলল, 'মাসিমা মেসোমশাই, আমরা আজ যাব।' সোনালীর দিকে গড়িয়াহাট থেকে কেনা টুকিটাকি জিনিসের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নে। তোর ব্রাশ ফ্রাশ রয়েছে।' বলেই উঠে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপও উঠে দাঁড়ালো। তবে ছেলেবেলা থেকে যে বাড়ি ফিক্সেসানের মতো মাথায় আটকে রয়েছে তা ছেড়ে এই মুহূর্তে যেতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু এখানে আরো খানিকক্ষণ যে কাটিয়ে যাবে তার অজুহাতই বা কী? সেও বলল, 'চলি—'

মমতা বললেন, 'আবার এসো—'

সন্দীপ মাথা নাড়ল। মনে মনে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব। আমাকে এখানে আসতে হবে।'

রাস্তায় বেরিয়ে বিকাশ বলল, 'দুর্দান্ত একখানা ম্যাজিক দেখিয়ে এলি। সবার মাথায় একেবারে প্রপেলার ঘুরিয়ে দিয়ে এসেছিস।'

অন্যমনস্কর মতো হেঁটে যাচ্ছিল সন্দীপ। বিকাশের কথা তার কানে ঢুকল না।

সন্দীপ সেই যে হস্টেলে এসেছিল তার পর দশটা দিন পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে সেসান শুরু হয়েছে। একা তারই না, শঙ্করণ আর বিকাশেরও। তিনজনের তিন সাবজেক্ট বলে একই সময় ওদের ক্লাশ শুরু হয় না। কারো হয়তো এগারোটায়, কারো সাড়ে বারোটায়, কারো আবার সকাল ন'টাতেই ক্লাশ। ছুটিও একসঙ্গে হয় না। ক্লাশের সময়টুকু বাদ দিলে বাকী দিন এবং গোটা রাতটা ওদের একসঙ্গেই কাটে।

শঙ্করণ এবং বিকাশ ফার্স্ট ইয়ারের শুরু থেকেই প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, যেমন করেই হোক ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। সারা সকাল এবং সন্ধের পর থেকেই দু'জনে বইয়ের ভেতর ডুবে থাকে। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে শঙ্করণ বাঙলাটা শিখে নিচ্ছে।

সন্দীপও দারুণ পড়ুয়া ছেলে। সে-ও নিয়মিত ক্লাশ করছে, সকালে এবং সন্ধের পর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত বইয়ের ভেতর নিজেকে গুঁজে রাখছে কিন্তু ক্লাসে নোট নিতে নিতে, হস্টেলে ফিরে পড়তে পড়তে কিংবা রাত্রে শুয়ে থাকতে থাকতে বার বার গথিক স্ট্রাকচারের একটা বাড়ির কথা তার মনে পড়ে যাচ্ছে। বাড়িটা দুরন্ত আকর্ষণে তাকে যেন অনবরত টানছে। কিন্তু সন্দীপ সেখানে যায় কী করে ? মাঝে মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে বিকাশকে বলেছে, 'তোর মাসি আর মেসোমশাইকে ভীষণ ভাল লেগেছে। ওঁরা কেমন আছেন ?'

'ভালই।'

'কী করে জানলি ? এর মধ্যে গিয়েছিলি ?'

'যাব কখন ? ক্লাশ লাইব্রেরি আর পড়ার পর কোথাও যাবার সময় আছে ? ফোন করে জেনে নিয়েছি।'

‘ও।’ একটু যেন হতাশই হয়েছে সন্দীপ।

চোখের কোণ দিয়ে বন্ধুকে দেখতে দেখতে বিকাশ জিজ্ঞেস করেছে, ‘মেসো-মাসির কথা জানতে চাইলি। আসল লোক সম্পর্কে তো কিছু বললি না।’

‘আসল লোক কে?’

‘সোনা।’

‘ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেমন আছে সোনালী?’

‘আমি বললাম বলে বুঝি জানতে চাইলি। ঠিক আছে, সোনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব তুই তার সম্বন্ধে টোটালি ইনডিফারেণ্ট।’

বিব্রতভাবে সন্দীপ বলেছে, ‘কী যা তা বলছিস!’

‘যা-তা? অথচ সোনাটা ফোন করলেই তোর কথা জিজ্ঞেস করে।’ বলে বিকাশ ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে।

সন্দীপ বলেছে, ‘তাই নাকি। সো নাইস অফ হার।’ একটু থেমে জিজ্ঞেস করেছে, ‘সোনালী কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘প্রেসিডেন্সিতেই?’

‘হ্যাঁ।’

‘কী অনার্স নিল?’

‘ইংলিশ।’

‘ওদের সেসান আরম্ভ হয়ে গেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘তোর সুবিধার জন্যে আরো দু-একটা খবর দিতে পারি।’

‘কী খবর?’

‘সোনা বাসে-ট্রামে কলেজে যায়। গড়িয়াহাট ট্রাম ডিপোর কাছে যে স্টপেজটা আছে সেখান থেকে রোজ বাস বা ট্রামে ওঠে। অবশ্য কোন্ দিন কখন ক্লাশ শুরু, জানি না। জেনে নিয়ে তোকে বলে দেব।’

অবাক হয়ে সন্দীপ জিজ্ঞেস করেছে, ‘এতে আমার কী সুবিধা?’

সন্দীপের নাকে আলতো করে টুসকি মেরে বিকাশ বলেছে, 'তুই একটা থার্ড ক্লাশ! কোন ঋষি-টিষির তপোবনে গরু হয়ে তোর ঘাস খাওয়া উচিত ছিল।'

এবার বুঝতে পারল সন্দীপ। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। মেয়েদের ব্যাপারে সে ভীষণ লাজুক। এই একুশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সে মেশেনি। সে সুযোগও হয়নি। চোখ নামিয়ে সন্দীপ বলল, 'সোনালী তোর বোন না?'

'হাজার বার। কিন্তু তোর বোন তো না।'

সন্দীপ চুপ। তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠেছে। সোনালী দারুণ সুন্দর, অত্যন্ত স্মার্ট। তার কথাবার্তা এবং ব্যবহার চমৎকার। তাকে দেখামাত্র ভাল লেগে যায়। সবই ঠিক কিন্তু তার সম্বন্ধে এ ক'দিন কিছুই ভাবেনি সন্দীপ। একবার মাত্র যাকে দেখেছে, যার সঙ্গে দু-একটার বেশি কথা হয়নি, তার সম্বন্ধে কী-ই ভাবতে পারে সে। মেয়েদের ব্যাপারে সন্দীপ খানিকটা পিউরিটানই। যাই হোক, এ ক'দিন সোনালীর কথা তার মনেই পড়েনি। শুধু ওল্ড বালিগঞ্জে গথিক স্ট্রাকচারের ঐ বাড়িটা, অমরনাথ, মমতা, যুধিষ্ঠির, তেইশ বছর আগে মৃত জয়ন্ত, এরাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। হয়তো সোনালী তার সম্বন্ধে বিকাশকে ফোনে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে থাকবে। আর তা নিয়ে যা খুশি তাই বলে যাচ্ছে বিকাশ। ও যে এ রকম ফাজিল, আগে বোঝা যায়নি।

মজাই করুক আর যা-ই করুক, বিকাশ তাকে এবং সোনালীকে জড়িয়ে যা ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে আর ওল্ড বালিগঞ্জের সেই বাড়িটায় যাবার কথা বলা যায় না। কিন্তু ঐ বাড়িটা তার হৃদ্‌পিণ্ডের ভেতর থেকে নিশির ডাকের মতো অনবরত তাকে যেন টানতে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানে সে যায় কী করে?

দেখতে দেখতে আরো দশটা দিন পেরিয়ে গেল। বিকাশের ও

ব্যড়িতে যাবার কোন লক্ষণই নেই। সন্দীপ লক্ষ্য করেছে, দু-এক দিন পর পরই বিকাশ ফোনটোন করে সোনালীর খবর জেনে নিয়েছে। বিকাশ যদি ওখানে না যায় এবং তার সঙ্গে যেতে না বলে, সন্দীপের পক্ষে হুট করে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু ঐ বাড়িটা? অমরনাথ, মমতা, যুধিষ্ঠির, জয়ন্তর ফোটো সব যেন কোন অলৌকিক আকর্ষণে সন্দীপকে এই হস্টেল থেকে উপড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্য দিন ক্লাশ শেষ হয়ে গেলে লাইব্রেরিতে চলে যায় সন্দীপ। আজ আর গেল না। নিজের অজান্তে কখন যে ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে একটা মিনি বাসে উঠে বসেছিল নিজেরই খেয়াল নেই। তারপর গড়িয়াহাট ওভারব্রিজ, গোল পার্ক ইত্যাদি পার হয়ে সুইনহো স্ট্রীটের মোড়ে এসে নেমে পড়েছে, তা-ও মনে করতে পারে না।

ট্রাম রাস্তা থেকে সুইনহো স্ট্রীটে ঢুকে প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে ঘুরতেই আচমকা একটা ঝাঁকুনি লাগল যেন। এ সে কী করছে? বিকাশকে বাদ দিয়ে একা একা ও বাড়িতে যাওয়াটা খুবই খারাপ দেখাবে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল সন্দীপ। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তার দিকে চলতে শুরু করল। এখানে এলে বিকাশের সঙ্গেই সে আসবে। যেতে যেতে সে অনুভব করতে লাগল, গথিক স্ট্রাকচারের সেই বাড়িটা পেছন থেকে তাকে ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, সন্দীপ পেছনে ফিরল না। এখন তাড়াতাড়ি তাকে হস্টেলে ফিরে যেতে হবে। সে যে এখানে এসেছিল, বিকাশ যেন কোন ভাবেই টের না পায়।

সুইনহো স্ট্রীটের মুখের বাস স্টপে এসে সন্দীপ দাঁড়িয়ে গেল। দূরে হাজরার মোড়ে একটা মিনিবাস দেখা যাচ্ছে। কোন্ রুটের কে জানে। যাদবপুর বা যোধপুর পার্কের হলে সে উঠে পড়বে।

ডান কাঁধ থেকে একটা সাইড ব্যাগ ঝুলছে সন্দীপের। তাতে ভারী ভারী ক'টা বই, খাতা, পেন, ডায়েরী-টায়েরী রয়েছে। ক্লাশ

থেকে সোজা চলে এসেছে বলে বই-টই রেখে আসতে পারেনি। এতক্ষণ একটানা ব্যাগটা থাকার জন্য কাঁধটা টনটন করছিল। সন্দীপ কাঁধ বদল করে নিল। মিনিবাসটা এর মধ্যে অনেক কাছে এসে পড়েছে। সন্দীপ দেখল যাদবপুরের গাড়ি। হাত তুলে থামাতে যাবে, হঠাৎ কে ডেকে উঠল, 'সন্দীপদা—'

কোন মেয়ের গলা। এদিক সেদিক তাকাতেই সন্দীপের চোখে পড়ল, রাস্তার মাঝখানে ট্রাম লাইনের জন্য যে আলাদা জায়গা রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সোনালী। সন্দীপ যে মিনিবাসটায় উঠে পড়বে তা সে বুঝতে পেরেছিল। চোখাচোখি হতেই সে গলার স্বর তুলে বলল, 'এ গাড়িটা ছেড়ে দিন—'

সন্দীপ আর হাত তুলল না। মিনিবাসটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা পেরিয়ে এপারে চলে এলো সোনালী। সন্দীপের চোখে পড়ল সোনালীর কাঁধ থেকেও হ্যাণ্ডলুমের চমৎকার সাইড ব্যাগ ঝুলছে। তার মসৃণ কপালে এবং গলায় এই শেষ শরতের বিকেলেও পোখরাজের দানার মতো অল্প অল্প ঘাম। বোঝা যায়, সে কলেজ থেকে ফিরছে।

সোনালী জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন? মেসোর বাড়ি?'

মেয়েদের সামনে কোন দিন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না সন্দীপ। সে যে সত্যি সত্যি অমরনাথদের বাড়ি যাবার জন্যই এখানে এসেছিল, মেয়েটা তা ধরে ফেলল নাকি? ভেতরে ভেতরে রীতিমত চমকে উঠল সে। আড়ষ্ট গলায় কোন রকমে বলল, 'না-না, এই কাছেই একটা দরকারে এসেছিলাম।'

সন্দীপের কাঁধে ঝোলানো সাইড ব্যাগটা দেখতে দেখতে সোনালী বলল, 'কলেজ থেকে স্ট্রেট এসেছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও কলেজ থেকে ফিরলাম। এখানে যে কাজে এসেছিলেন হয়ে গেছে?'

সোনালীর চোখের দিকে তাকিয়ে ডাহা মিথ্যেটা আর বলা গেল না। মুখ নামিয়ে সন্দীপ আস্তে ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ হয়ে গেছে।

'হস্টেলে ফিরে গিয়ে এখন কী করবেন?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তা হলে চলুন আমার সঙ্গে। চা খেয়ে একটু গল্প-টল্প করে ফিরবেন।'

সন্দীপ বলল, 'আজ থাক। বিকাশের সঙ্গে অন্য একদিন আসব।'

সোনালী বলল, 'দাদার সঙ্গে তো আসবেনই। আজ যখন এত-দূর এসেই গেছেন, প্লীজ চলুন। মাসি-মেসো আপনাকে দেখলে ভীষণ খুশি হবেন।'

বাড়িটার কাছাকাছি এসে ফিরে যাচ্ছিল সন্দীপ। কিন্তু তার আর উপায় নেই। আস্তে করে সে বলল, 'আচ্ছা চলুন, আপনি যখন—'

অবাক চোখে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল সোনালী, 'এ কী!'

সন্দীপ হকচকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'সেদিন তুমি করে বললেন। আর আজ শুনছি চলুন। একেবারে আপনি-টাপনিতে প্রমোশান দিয়ে দিলেন। আমার কিন্তু বিশ্রী লাগছে।'

বিব্রত মুখে সন্দীপ কোন রকমে বলতে পারল, 'ঠিক আছে। আপনি করে আর বলব না। তুমি করেই—'এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল।

ঠোঁট কামড়ে দারুণ মিষ্টি করে একটু হাসল সোনালী। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, এবারটা ক্ষমা করে দেওয়া গেল। কিন্তু আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না; সেই দশটা থেকে ছ'টা ক্লাশ করেছি। খিদে পেয়ে গেছে।'

পাশাপাশি চুপচাপ ওরা খানিকক্ষণ হাঁটল। চলতে চলতে হঠাৎ সন্দীপের খেয়াল হল, এতক্ষণ বাস রাস্তায় সোনালীই একতরফা কথা বলে গেছে। সে শুধু উত্তর দিয়েছে; নিজের থেকে তাকে

কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। এটা অভদ্রতা। কিন্তু কী জানতে চাইবে সে? খানিকক্ষণ চিন্তা করে সন্দীপ বলল, 'কলেজ কী রকম লাগছে?'

সোনালী বলল, 'খুব ভাল।'

'বন্ধু-টন্ধু হয়েছে?'

'প্রচুর।'

'কলকাতা কেমন লাগছে?'

'ফ্যানটাসটিক। আপনার?'

'ভালই তো।'

সোনালী বলল, 'জানেন, সেদিন দাদার সঙ্গে সেই যে চলে গেলেন, তারপর থেকে মাসি মেসো আপনার কথা অনেকবার বলেছেন।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

সোনালী ফের বলল, 'ওঁরা বলছিলেন আপনার মতো এমন সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আর কারো ছাখেননি। বিশ্বাস করুন, আমিও দেখিনি।'

সন্দীপ এবারও চুপ করে থাকল।

সোনালী বলল, 'কী, কিছু বলছেন না যে?'

সন্দীপ কেমন করে বোঝাবে যে সে কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়। এ বাড়িটা বা এটার সঙ্গে জড়ানো লোকজন ছাড়া পৃথিবীর আর কোন মানুষ বা বাড়ি-টাড়ি সম্পর্কে সে কিছুই বলতে পারবে না। সুতরাং আরো একবার তাকে মুখ বুজে থাকতে হল।

এক সময় তারা সেই গথিক স্ট্রাকচারের প্রকাণ্ড বাড়িটায় পৌঁছে গেল।

আজ আর সবুজ লনে অমরনাথকে দেখা গেল না। তবে মালীরা এধারের লনে আর ওধারের বাগানে কাজ করে যাচ্ছে।

সোনালীর সঙ্গে নুড়ির রাস্তা থেকে থামওলা বারান্দায় উঠে এলো সন্দীপ। সেখান থেকে ড্রইং রুমে। এখানেও কেউ নেই। সোনালী একেবারে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, 'মাসি মেসো দেখবে এসো কাকে ধরে এনেছি।'

দোতলা থেকে অমরনাথ আর মমতার গলা ভেসে এলো, 'কাকে এনেছিস ?'

'একবার নিচে এসোই না—' বলে সন্দীপের দিকে ফিরল সোনালী, 'আপনি একটু বসুন। আমি ওপর থেকে আসছি।'

ড্রইং রুমের একধারে যে ফ্যাশনেব্‌ল সিঁড়ি রয়েছে সেটা দিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে ওপরে উঠে গেল সোনালী। আর সন্দীপ একটা সোফায় বসে পড়ল। একটুক্ষণ বসে থাকার পর নিজের অজান্তেই তার চোখ দুটো কোন এক অনিবার্য নিয়মে জয়ন্তর ফোটোটার দিকে ঘুরে গেল। সেদিনের মতোই ফোটোটায় রজনীগন্ধার মালা আর নিচে ধূপকাঠি জ্বলছে। রোজই বোধ হয় ফোটোটায় রজনীগন্ধার মালা পরানো হয় আর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখা হয়।

ফোটোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর একসঙ্গে পঞ্চাশটা ব্যাণ্ড পার্টির বাজনা শুনতে পেল সন্দীপ। আর চোখের সামনে অদৃশ্য কোন পর্দায় ছোট্ট নগণ্য পলাশপুর স্টেশন, একটা ফাঁকা ফার্স্ট ক্লাস কামরায় অবিকল জয়ন্তর মতো একটা যুবক আর একটা গাট্টাগোট্টা চেহারার লোক এবং তার হাতে রিভলবার ফুটে উঠতে লাগল। এই লোকটাকে ট্রেনের কামরায় ছাড়াও আরো কোথায় দেখেছে। কোথায় ? কোথায় ?

মনে করা গেল না। তার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ কানে এলো। চমকে সন্দীপ ঘাড় ফেরাল। অমরনাথ মমতা আর সোনালী নেমে আসছে।

ওঁরা আসতেই সন্দীপ উঠে দাঁড়াল। অমরনাথ বললেন, 'বোসো বোসো – '

সবাই বসার পর অমরনাথ বললেন, 'সোনার কাছে শুনলাম, তুমি নাকি সুইনহো স্ট্রীটের মুখ পর্যন্ত এসে চলে যাচ্ছিলে!'

সন্দীপ বলল, 'না, মানে—'

'দিস ইজ ব্যাড, ভেরি ব্যাড—'

কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে সন্দীপ সোনালীকে যা বলেছিল, অমরনাথকেও তাই বলল। অর্থাৎ দরকারী একটা কাজে এখানে এসেছিল। পরে বিকাশের সঙ্গে সে অমরনাথদের বাড়ি আসত ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমরনাথ মজা করে বললেন, 'আমাদের বাড়ি থেকে সুইনহো স্ট্রীটের মোড় টু হানড্রেড ইয়ার্ডসও হবে না। এত কাছে এসে আমাদের এখানে না আসাটা ঘোর অন্যায়। আর একটা কথা, বিকাশের সঙ্গেই যে আসতে হবে তার কোন মানে নেই। তোমার যখন ইচ্ছা হবে চলে আসবে।'

মমতাও একই কথা বললেন, 'নিশ্চয়ই চলে আসবে।'

'আচ্ছা—' সন্দীপ মাথা নাড়ল।

অমরনাথ এবার মমতার দিকে তাকালেন, কাঁধে বই-খাতার ব্যাগ। ছেলেটা নিশ্চয়ই কলেজ থেকে আসছে। বললেন, 'ওকে কিছু খেতে-টেতে দাও।'

মমতা বললেন, 'সোনাটাও কলেজ থেকে ফিরল। যুধিষ্ঠিরকে বলে এসেছি, দু'জনের খাবার এখানে দিয়ে যাবে।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যেই যুধিষ্ঠির দু'জনের মতো লুচি, বেগুনভাজা, কপির তরকারি, ডিম ভাজা, মিষ্টি আর চারজনের মতো চা নিয়ে এলো। সেদিনকার মতো আজও মমতা প্লেটে প্লেটে লুচি-টুচি সাজিয়ে সোনালী আর সন্দীপকে দিয়ে বললেন, 'খাও—'

যুধিষ্ঠির কিন্তু খাবারের ট্রে নামিয়ে দিয়েই চলে যায়নি। দু চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে সন্দীপের দিকে সে তাকিয়ে আছে। সন্দীপ সম্পর্কে তার দুর্দান্ত কৌতূহল।

অমরনাথ বললেন, 'সেদিন তো আমাদের একের পর এক

সারপ্রাইজ দিলে। আজও কিছু দেবে নাকি?'

খেতে খেতে এক পলক অমরনাথের দিকে তাকাল সন্দীপ। তবে কোন উত্তর দিল না।

অমরনাথ আবার বললেন, 'সেদিন যুধিষ্ঠির আর জয়ন্তকে আগে না দেখেও ওদের নাম বলেছিলে। বিকাশ বলছিল, এখানে কোন দিন না এসেও টকাটক এখানকার টোপোগ্রাফি বলে দিয়েছিলে। যখন জানতে চাইলাম কী করে এ সব বললে তুমি কী উত্তর দিয়েছিলে মনে আছে?'

'আছে।' বলে সন্দীপ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'হঠাৎ অনেক জিনিস আমার মনে হয়। পরে দেখেছি সেগুলো মিলে যায়।' যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়ে বলল, 'সেদিন ওকে দেখে মনে হয়েছিল ওর নাম যুধিষ্ঠির। সেটা সত্যি হয়ে গেল।'

অমরনাথ বললেন, 'দেখ তো, এই বাড়িটা বা আমাদের সম্বন্ধে আর কিছু মনে হচ্ছে নাকি?' তাঁর বলার ভঙ্গিতে কিছুটা কৌতুক মেশানো।

সন্দীপ অমরনাথের চোখের দিকে তাকাল। আস্তে করে বলল, 'হচ্ছে।'

'কী?'

'এই বাড়িটার একতলায় ছ'টা ঘর। একটা ঘর ছাড়া বাকী পাঁচটায় অ্যাটাচ্‌ড বাথ। দোতলায় পাঁচটা ঘর। তেতলায় তিনটে ঘর। তার মধ্যে একটাতে রয়েছে রাধামাধব ঠাকুর।'

মমতা প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'ঠিক বলেছ বাবা।'

শুনতে শুনতে চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠছিল অমরনাথের। কিন্তু এককালে বাঘা পুলিশ অফিসার ছিলেন তিনি। কোন কিছুই যাচাই না করে মেনে নেন না। বললেন, 'তুমি যা যা বলেছ, হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। এখন বল তো, রাধামাধবের যে মূর্তিটা রয়েছে সেটা কী মেটালে তৈরি?'

সন্দীপ বলল, 'মেটালে না, কালো পাথরে তৈরি।'

সন্দীপ যা বলেছে তা সত্যি। আসলে তাকে পরীক্ষা করার জন্য মেটালের কথা বলেছিলেন অমরনাথ। হঠাৎ তিনি সোনালীর দিকে ফিরলেন। বললেন, 'কি রে, এ সব ইনফরমেসন তুই সন্দীপকে সাপ্লাই করেছিস নাকি ?'

ঠিক এ রকম একটা কথা সেদিন বিকাশকেও বলেছিলেন অমরনাথ। সোনালী জোরে জোরে মাথা নেড়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল, 'কক্ষনো না। বাড়ির ব্যাপারে সন্দীপদার সঙ্গে কোন কথাই হয়নি আমার।'

অমরনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, খানিকটা দূরে একটা ছোট টিপয় টেবলে টেলিফোন বেজে উঠল। মমতা বললেন, 'ফোনটা ধর তো সোনা—'

সোনালী উঠে গিয়ে টেলিফোন তুলে দু-একটা কথা বলল। তারপর মাউথপীসের মুখটা এক হাতে আটকে এধারে ফিরে জানালো, বিকাশের ফোন। জানিয়েই আবার কথা বলতে লাগল। ওপাশ থেকে বিকাশ কী বলছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে সোনালীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, কে কেমন আছে, পড়াশোনা কী রকম হচ্ছে, জলপাইগুড়ি থেকে মা-বাবার চিঠি এসেছে কিনা, ইত্যাদি নিয়ে দু'জনে খবর-টবর নিচ্ছে।

হঠাৎ সোনালী বলে উঠল, 'জানিস দাদা, সন্দীপদা আমাদের এখানে এসেছে।'

বিকাশ কী বলল, জানা সম্ভব হল না।

সোনালী বলল, 'সেই বিকেলবেলা এসেছে। এখনও আছে।...ঐ তো মাসি মেসোর সঙ্গে গল্প করছে।...ফোনটা ওকে দেব ?' বলে সন্দীপের দিকে ফিরল, এখানে আসুন, দাদা আপনার সঙ্গে কথা বলবে।'

সন্দীপ কিছুটা নার্ভাস বোধ করল। তারপর সোফা ছেড়ে উঠে গিয়ে সোনালীর হাত থেকে ফোনটা নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই বিকাশের গলা ভেসে এলো, 'ক্লাশের পর লাইব্রেরিতে গিয়ে তোকে দেখলাম না, হস্টেলে ফিরেও তোর পাত্তা নেই। শঙ্করণ আর আমি খুবই

ভাবছিলাম। এখন দেখছি কারেক্ট জায়গায় গিয়ে হাজির হয়েছিস! চালিয়ে যাও ব্রাদার —'

কানের লতি ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল সন্দীপের। বিকাশের কথা যদিও সে ছাড়া আর কারো শোনার সম্ভাবনা নেই তবু ঘাড় ফিরিয়ে একবার অমরনাথদের দেখে নিল সে। তারপর মুখটা ফোনের ভেতর গুঁজে দিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল, 'কী হচ্ছে বিকাশ! আমি গড়িয়াহাটের দিকে এসেছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় সোনালীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই—'

তার কথা শেষ হবার আগেই বিকাশ চেঁচিয়ে উঠল, 'হবেই, হবেই। সোনার ছুটির টাইমটা ক্যালকুলেট করে গেলে দেখা হতে বাধ্য। আচ্ছা, আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছি—'

সন্দীপের আরো কিছু বলার ছিল। কিন্তু তার আগেই লাইন কেটে দিল বিকাশ। সন্দীপ ফিরে গিয়ে আবার সোফায় বসল। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল তার। সে কী জন্য এখানে এসেছে আর বিকাশটা তার কী মানে করছে!

অমরনাথ সন্দীপকে আবার বললেন, 'সেদিন তো আমাদের একটার পর একটা চমক দিয়ে গিয়েছিলে। আজ সে-রকম কিছু দেবে নাকি?'

সন্দীপ বলল, 'চমক কিনা জানি না। তবে আপনাদের এই বাড়িটা সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু মনে হয়।'

'কী রকম?'

'এই বাড়িটার পেছনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে।'

'সেটা ওখানে না গিয়েও আন্দাজ করা যায়।'

'ওখান থেকে একটা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে।'

'এটাও কমন সেন্সের ব্যাপার। আমাদের বাড়ির মতো কলকাতায় পুরনো আমলের সব বাড়িতেই পেছন দিক দিয়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি রয়েছে।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ অমরনাথের দিকে তাকিয়ে থাকল সন্দীপ। অমরনাথের হয়তো ধারণা, এ বাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় খবর বিকাশ এবং সোনালী তাকে দিচ্ছে কিংবা নিছক কমন সেন্স থেকেই সে এ সব কথা বলছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সন্দীপ এবার বলল, 'এখন আমি এমন একটা কথা বলব যা ঠিক কমন সেন্স থেকে বলা যায় না। বিকাশ বা সোনালীর পক্ষে সে খবর দেওয়া সম্ভব না।'

চোখে-মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়ে অমরনাথ বললেন, 'দেয়ার ইউ আর। আমি তো তাই চাই।'

সন্দীপের চোখের সামনে অনেকবার দেখা সেই সিনেমার স্লাইড ফুটে উঠতে লাগল। সে বলল, 'আপনাদের এই বাড়িটার পেছন দিকে একটা লম্বা টিনের শেড আছে। তাতে লোহার রেলিং ঘেরা অনেকগুলো খাঁচার মতো ঘর।'

'মিলল না, মিলল না। আমাদের বাড়ির পেছনে কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা জায়গা।'

'এখন না থাকলেও অনেক দিন আগে ছিল। খুব ভাল করে ভেবে দেখুন।'

চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগলেন অমরনাথ। আর ওধার থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন মমতা, 'হ্যাঁ ছিল।' স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'মনে নেই? সেই যে—'

অমরনাথের মনে পড়ে গেল। রীতিমত অবাকই হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, 'সে তো প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা। আই অ্যাডমিট এটা বিকাশ আর সোনার পক্ষে জানা সম্ভব না। তোমার পক্ষেও না। হাউ ওল্ড আর ইউ?'

'একুশ বছর কমপ্লীট করতে এখনও তিন মাস বাকী।'

অমরনাথ এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে পারো ঐ খাঁচাগুলোতে কী ছিল?'

'একটা খাঁচায় চিতাবাঘ ছিল, একটায় ছোট ভালুক, একটাতে হরিণ, একটাতে অনেকগুলো খরগোস। সব মিলিয়ে ছোটখাটো একটা 'জু'।'

'অ্যাবসোলুটলি কারেক্ট।' বলে জয়ন্তর ফোটোটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সন্দীপ, 'জু-টা ছিল আপনার ঐ ছেলের। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে তার ভীষণ কৌতূহল ছিল।'

আস্তে মাথা নাড়লেন অমরনাথ। জয়ন্তর কথা উঠতেই গোটা ঘরের আবহাওয়া সেদিনের মতো ভারী হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ।'

এবার যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরল সন্দীপ। বলল, 'তুমি এদিকে একটু এসো তো যুধিষ্ঠিরদা।' বিমূঢ়ের মতো যুধিষ্ঠির এগিয়ে এলে এক কাণ্ডই করে বসল সন্দীপ। উঠে দাঁড়িয়ে ঝট করে তার ফতুয়াটা ওপর দিকে টেনে তুলে দিল। যুধিষ্ঠিরের পিঠে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাংস ডেলা পাকিয়ে শুকিয়ে আছে। অনেক কাল আগের বড় রকমের দগদগে ঘা শুকিয়ে গেলে যেমন দেখায়, অবিকল সেই রকম। পিঠটা দেখাতে দেখাতে সন্দীপ বলল, 'যুধিষ্ঠিরদা পোষা চিতার খাঁচা খুলে মাংস খাওয়াতে গিয়েছিল। হঠাৎ বিগড়ে গিয়ে জন্তুটা থাবা মেরে ঐ কাণ্ড করেছে। কি—ভুল করলাম?'

অলৌকিক কোন যাদুর খেলা যেন দেখছেন অমরনাথরা। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর শ্বাসরুদ্ধের মতো অমরনাথ বললেন, 'না, কোথাও ভুল নেই।'

সন্দীপ বলতে লাগল, 'যুধিষ্ঠিরদাকে জখম করার পর আপনার ছেলে চিতাটাকে সাতদিন খেতে দেয়নি। মনে পড়ে?'

'আমার মনে নেই। কত দিনের কথা!'

যুধিষ্ঠির এই সময় বলে উঠল, 'আমার মনে আছে। সত্যিই দাদাবাবু ওকে খেতে দেয়নি। আমি রোজ মাংস দিয়ে আসতাম। আমাকে মানা করে দিয়েছিল।'

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন মমতা। বোঝা যায়, নিজের হারানো সন্তানের জন্য তাঁর এই কান্না। সোনালী তাঁকে জড়িয়ে ধরে গভীর গলায় বলতে থাকে, 'কেঁদো না মাসি, কেঁদো না—'

কান্নার শব্দ একেবারে থামে না, তবে অনেকটা কমে আসতে থাকে।

এদিকে অমরনাথ অন্য একটা কথা ভাবছিলেন। এমন অদ্ভুত অকল্পনীয় ব্যাপার তাঁর বাহাত্তর তিয়াত্তর বছরের জীবনে কখনও ঘটেনি। ভাবতে ভাবতে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা সম্ভাবনা তাঁর মাথায় দেখা দেয়। সন্দীপের দিকে ঝুঁকে তিনি বলতে থাকেন, 'তোমার যা মনে হয়, দেখা যাচ্ছে সবই সত্যি। একটা বিষয়ে তোমার সাহায্য আমার খুব দরকার বাবা।'

সন্দীপ বলে, 'কী বিষয়ে?'

'দরকারের কথাটা পরে বলছি। তার আগে জয়ন্ত সম্বন্ধে তুমি কিছু বল।'

সমস্ত স্নায়ুর ভেতর দিয়ে চমক খেলে যায় সন্দীপের। সে বলে, 'কী বলব?'

'তোমার যা মনে হয়।'

জয়ন্ত সম্পর্কে কত কী-ই তো মনে হচ্ছে। সেই অদৃশ্য পর্দায় সিনেমা স্লাইডের মতো জয়ন্তকে ঘিরে নানা দৃশ্য ক্রমাগত ফুটে উঠছে। কিন্তু ওধারে মমতা দু'হাতে মুখ ঢেকে সমানে কেঁদে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় কিছু বলা ঠিক হবে না। সন্দীপ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ওধারে বাড়িটার পিছন দিক। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঝাঁক ঝাঁক জোনাকি উড়ছে; কোন্ পাতাল থেকে ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপের শব্দ উঠে আসছে। দূরমনস্কর মতো সন্দীপ বলল, 'এখন আমার আর কিছু মনে হচ্ছে না। পরে মনে হলে বলব।'

'ঠিক আছে।'

'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার আমি যাব মেসোমশাই।'

'আরেকটু বোসো না। একেবারে রাত্তিরে খেয়ে যেও।'

'আজ থাক। অন্য একদিন বিকাশের সঙ্গে এসে খেয়ে যাব।'

অমরনাথ আর জোর করলেন না। শুধু বললেন, 'আবার কবে আসছ?'

সন্দীপ কী করে বলে এই বাড়িটা দুরন্ত আকর্ষণে অনবরত তাকে টানছে; রোজই এখানে তার আসার ইচ্ছা। সে বলল, 'এখন তো ক্লাশ শুরু হয়ে গেছে। ছুটি-টুটি পেলে নিশ্চয়ই চলে আসব।' বলতে বলতে উঠে পড়ল।

অমরনাথ বললেন, 'ড্রাইভারকে বলছি, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

'গাড়ির দরকার নেই। মিনি-টিনি ধরে আমি চলে যেতে পারব।'

অমরনাথ আর কিছু বললেন না। বাড়ির গেট পর্যন্ত তাঁরা সবাই সন্দীপের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এবং প্রত্যেকেই জানিয়ে দিলেন সন্দীপকে তাঁরা খুব তাড়াতাড়িই আবার একদিন এ বাড়িতে আশা করছেন।

সন্দীপ একটু হাসল। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে অমরনাথরা ড্রইং রুমে ফিরে এলেন। সোনালী আর মমতা এখানে আর বসলেন না; সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। সোনালীর কাল কলেজ আছে; পড়াশোনা করতে হবে। মমতার অনেক ঘরের কাজ পড়ে আছে। তবে অমরনাথ এখানেই থেকে গেলেন। টেলিফোনের কাছে যে সোফাটা রয়েছে সেখানে বসে সিগার ধরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কর মতো সিগার খাওয়ার পর টেলিফোনটা তুলে লালবাজারের নম্বর দেখে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গেই লাইনটা পাওয়া গেল। ওধার থেকে 'হ্যালো লালবাজার' বলতেই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর শশধর মল্লিককে চাইলেন। শশধর একসময় তাঁর আণ্ডারে সি. বি. আইতে ছিল।

শশধর লালবাজারেই ছিল। টেলিফোনে তার ঘুমন্ত গলা ভেসে এলো, 'কে বলছেন?'

শশধরের কণ্ঠস্বরের মজাই এই। শুনলে মনে হবে সর্বক্ষণ সে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু তার শরীরের অরগ্যান এত সজাগ যে বলে বোঝানো যায় না। এমন এফিসিয়েন্ট অ্যাসিস্টান্ট একটিও পাননি তিনি। বললেন, 'আমি অমরনাথ—'

ঘুম থেকে আচমকা যেন জেগে উঠল শশধর। বলল, 'প্রণাম নেবেন স্যার। আপনার শরীর কেমন? বৌদি কেমন আছেন?' এক-নাগাড়ে ঝড়ের বেগে অনেকগুলো প্রশ্ন করে গেল সে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আদায় করে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ আমাকে স্মরণ করলেন, কিছু দরকার আছে?'

অমরনাথও শশধরের শরীর স্বাস্থ্য এবং তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ের খবর-টবর নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, একটু দরকার আছে।'

'বলুন স্যার।'

সন্দীপের হস্টেলের নাম এবং রুম-নাম্বার জানিয়ে অমরনাথ বললেন, 'এই ছেলেটার ওপর একটু নজর রাখতে হবে।'

শশধর বলল, 'ক্রিমিনাল-ট্রিমিনাল নাকি? কোন রকম গোলমেলে কেস?'

'চোর ছ্যাচোড় ঘাঁটতে ঘাঁটতে ও সব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না দেখছি। সন্দীপ ইজ এ ফাইন বয়, ব্রিলিয়াণ্ট স্টুডেণ্ট। তার মধ্যে কোন রকম গোলমাল নেই।'

বিমূঢ়ের মতো শশধর বলল, 'যাদের নামের আগে 'ফাইন,' 'ব্রিলিয়াণ্ট' এই সব অ্যাডজেকটিভ বসে তাদের নিয়ে তো আমার কোন কারবার নেই স্যার—'

সন্দীপ সম্পর্কে সামান্য দু-একটা কথা বলে অমরনাথ বললেন, 'ওকে শুধু ওয়াচ করে যাবে। যদি কোন রকম অ্যাবনর্মাল বা সুপার-ন্যাচারাল কিছু দেখতে পাও ইমিডিয়েট্‌লি আমাকে জানিয়ে দেবে। ঠিক আছে?'

'আছে স্যার। আর কিছু।'

'তার ওপর যে ওয়াচ রাখা হচ্ছে এটা যেন সন্দীপ টের না পায়।'

না স্যার। তারক বলে আমাদের ডিপার্টমেণ্টে একটা তুখোড় ছোকরা আছে না? আপনি তো তাকে চেনেন।'

'হ্যাঁ।'

'ঐ মালটাকে হস্টেলের বয় বানিয়ে ফিট করে দিচ্ছি। সন্দীপ দত্তর ফোর ফাদারও ওকে ধরতে পারবে না।'

'তা হলে আমি নিশ্চিন্ত রইলাম মল্লিক।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

'লাইনটা কেটে দিয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ সিগার খেলেন অমরনাথ। তারপর ফের ফোনটা তুলে নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। একটু পর লাইনে একটা মেয়ে-গলা ভেসে এলো। অমরনাথ বললেন, 'কে রে চন্দনা নাকি?'

ওধারে মেয়েটি গলা চিনতে পেরে বলল, 'অমরকাকা না?'

'হ্যাঁ। তোর বাবা বাড়ি আছে?'

'আছে।'

'তাকে বল আমি কথা বলব।'

'আপনি ধরে থাকুন; বাবাকে ডেকে আনছি।'

খানিকটা পর চন্দনার বাবা বিধুশেখরের গলা শোনা গেল, 'কী খবর অমর?'

বিধুশেখর অমরনাথেরই সমবয়সী এবং একমাত্র বন্ধু। ছেলেবেলায় এক পাড়ায় থাকতেন। একসঙ্গেই স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। কলেজে পড়তে পড়তে বিধুশেখররা ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে হিন্দুস্থান পার্কে নতুন বাড়ি করে উঠে যান। তারপরও সম্পর্কটা অটুটই আছে। ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করে বিধুশেখর পি. এইচ. ডি. করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার একটা বড় কলেজে লেকচারারশিপ পেয়ে যান। লেকচারার থেকে কয়েক বছরের ভেতর হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট। তার বছর দশেক বাদে ইউনিভার্সিটিতে চলে আসেন।

ক'বছর হল তিনি রিটায়ার করেছেন। রিটায়ারমেণ্টের আগে রীডার হয়েছিলেন। আর এম. এ. পাশ করার পর আই. পি. এস. হয়ে প্রথমে লালবাজারে ডিটেকটিভ, পরে সি. বি. আইতে চলে যান অমরনাথ। সেখান থেকেই তিনি রিটায়ার করেছেন। অমরনাথ এখনও যতটা কর্মক্ষম আছেন, বিধুশেখর ঠিক তার উল্টোটা। শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। ডান হাতে আরথ্রাইটিস, প্রস্টেটে গণ্ডগোল, ঘাড়ে নিউ-র‍্যালজিক পেইন ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশি চলাফেরা করতে পারেন না। তবে দুই বন্ধু মাঝে মাঝে টেলিফোনে অনেকক্ষণ গল্প করেন। সময়-টময় পেলে অমরনাথ বন্ধুকে দেখতে চলে যান। আজ যে অমরনাথ বিধুশেখরকে ফোন করলেন তা নিছক বন্ধুর শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্যই না। বিধুশেখর অধ্যাপনার সঙ্গে কিছু কিছু ওকাল্টিজম অর্থাৎ গূঢ়বিদ্যা এবং জ্যোতিষের চর্চা করেন। এ ব্যাপারে চেনাজানা মহলে তাঁর দারুণ নাম।

অমরনাথ বললেন, 'তোমার শরীর-টরীর কেমন ?'

বিধুশেখর বললেন, 'নো চেঞ্জ। আরথ্রাইটিস আর নিউর‍্যালজিক পেইনটা আগেই পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট করে বসেছিল। ওগুলোর সঙ্গে নতুন জুটেছে ইনসমনিয়া। তোফা আছি।'

'একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে ফোন করছি।'

'বল—'

সন্দীপ সম্পর্কে মোটামুটি সব কিছু জানিয়ে অমরনাথ বললেন, 'এই ছেলেটা আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তুমি তো নানা রকম গুহ্যবিদ্যা নিয়ে কারবার কর। সন্দীপ সম্পর্কে তোমার কী মনে হয় ?'

তক্ষুনি কিছু বললেন না বিধুশেখর। বেশ খানিকটা পর খুব ধীর গলায় শুরু করলেন, 'তুমি যা বললে তা তো রীতিমত অদ্ভুত ঘটনা। সারা জীবন তো ক্রাইম নিয়ে নাড়াচাড়া করেছ। কী মনে হয়, কোন সোর্স থেকে খবরটবর জোগাড় করে ছোকরা তোমায় তাক লাগিয়ে দিচ্ছে।'

অমরনাথ বললেন, 'এতে ওর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?'

বিধুশেখর বললেন, 'তা কী করে বলব! হয়তো কোন মোটিভ আছে।'

'আমার মনে হয় না। ছেলেটাকে খুবই ইনোসেন্ট দেখতে। তা ছাড়া এই সিটিতে প্রথম এসেছে। আমাদের বাড়ি সম্বন্ধে এত খবর যোগাড় করা ওর পক্ষে ইমপসিব্‌ল।' বলে একটু থামলেন অমরনাথ। পরে বেশ চিন্তা করে বললেন, 'তবে যদি সত্যি সত্যি খবর-টবর নিয়ে এ সব বলে থাকে তা হলে বলতে হবে এ রকম ক্রিমিনাল খুব বেশি জন্মায়নি।'

'ছেলেটা সম্পর্কে খোঁজ-টোঁজ নিয়েছ? এই ধর ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড কী, মা-বাবা কেমন, ফ্যামিলি হিস্ট্রি-টিস্ট্রি—এই সব আর কি।'

'না, এখনও নিইনি। তবে ওর ওপর ওয়াচ রাখবার ব্যবস্থা করেছি, কিছু দিন দেখি; যদি সন্দেহজনক কিছু মনে হয় পরে মা-বাবা ধরে টান দেব।'

'সেই ভাল। ছেলেটাকে দেখার জন্য বড় কৌতূহল হচ্ছে অমর।'

'বেশ তো। কবে আসতে পারবে বল। সন্দীপ আমার এক শালীর ছেলের রুমমেট। বিকাশকে খবর দিলেই ওকে নিয়ে আসবে।'

'আমার হেল্‌থের অবস্থা তো জানো। আগে থেকে কোন রকম প্রোগ্রাম করা মুশকিল। যেদিন আসছি বলব সেদিনই হয়তো নিউর্যা-লজিক পেইনে বা ব্লাড সুগারে কাবু হয়ে পড়লাম।'

'তা হলে?'

বিধুশেখর বললেন, 'ছেলেটা কি তোমার কাছে মাঝে মাঝে আসে?'

অমরনাথ বললেন, 'আজকে নিয়ে সেকেণ্ড টাইম এসেছে।'

'এক কাজ কোরো, নেক্সট টাইম এলে আমাকে একটা ফোন কোরো। শরীর সুস্থ থাকলে চলে যাব।'

'সেই ভাল।' অমরনাথ ফোন নামিয়ে ক্রেডেলে রেখে দিলেন।

সেই যে সন্দীপ এক বিকেলে ঘোরের মধ্যে ছুট করে সোজা কলেজ থেকে অমরনাথদের ওখানে চলে গিয়েছিল, তারপর একটা মাস কেটে গেছে। ওল্ড বালিগঞ্জের গথিক স্ট্রাকচারের বাড়িটা এই একটা মাস সারাক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তবু আর যাওয়া হয়নি। পুরোদমে এখন ক্লাশ চলছে। ক্লাশের পর লাইব্রেরি, লাইব্রেরির পর হস্টেলে ফিরে রেস্ট নিয়ে আবার পড়া।

এর মধ্যে মনে করে রাখার মতো বিশেষ কিছুই ঘটেনি। বেনারস থেকে এক মাস অর্থাৎ চার সপ্তাহে মা-বাবার চারটে আর দিল্লী থেকে দাদার একটা, মোট পাঁচটা চিঠি এসেছে। সবগুলো চিঠির বক্তব্য একই। সন্দীপ যেন সাবধানে থাকে, রেগুলার ক্লাশ করে, পড়াশোনায় ফাঁকি না দেয়। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে। কলকাতা বিশাল শহর। ওখানে পায়ে পায়ে বিপদ। সন্দীপ যেন বেশি ঘোরাঘুরি না করে, বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুবান্ধব ছাড়া কারো বাড়ি না যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দীপ এই পাঁচটা চিঠিরই উত্তর দিয়েছে।

হস্টেল লাইফে হৈ-চৈ এবং ভ্যারাইটি প্রচুর। কিন্তু এ কথাটা সন্দীপদের পক্ষে খাটে না সেই যে রণধীররা তাদের ঘরের কাগজে 'গুড বয়েজ' লিখে পোস্ট করে দিয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে কেউ তাদের বিরক্ত করে না। গুড বয়েজ-এর স্ট্যাম্পটা তাদের সব রকম ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

হস্টেলের আর কেউ না এলেও এই এক মাসে রণধীর তার দু-চারজন চামচে সঙ্গে করে এক আধবার হানা দিয়েছে। সন্দীপ বিকাশ কি শঙ্করণের বিছানায় যোগ ব্যায়ামের পদ্মাসনের পোজে বসে দুই হাত গাঁজার কল্কে বানিয়ে তার ফাঁকে একটা কিং সাইজ সিগারেট বসিয়ে

টানতে টানতে জিজ্ঞেস করেছে, 'স্টাডি কী রকম হচ্ছে ?'

সন্দীপরা বলেছে, 'আপনার কী রকম মনে হয় ?'

চোখ কুঁচকে নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রণধীর বলেছে, 'আমি নজর রেখে যাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত তোরা যে ভাবে চালাচ্ছিস সেটা স্যাটিসফ্যাক্টরি। তবে—'

'তবে কী ?'

'কাউকে তোদের এরিয়াতে ঢুকতে দিই না। কেউ তোদের ডিসটার্ব করে না। মাকড়ারা, তোদের আরামে রেখেছি। এরপরও যদি ফার্স্ট ক্লাশ না পাস, তো মনুমেন্টের মাথায় চড়িয়ে একটা করে হাই কিক ঝেড়ে উড়িয়ে দেব।'

এই একমাসে আর যা-যা ঘটেছে তা এই রকম। সন্দীপ এবং বিকাশের ট্রেনিংয়ে থেকে শঙ্করণ মোটামুটি বাঙলাটা শিখে ফেলেছে। আর অমরনাথ তাঁদের বাড়ি যাবার জন্য তু-চারদিন পর পরই ফোন করে গেছেন।

আজ মোটে তুটো ক্লাশ ছিল সন্দীপের, সাড়ে দশটায় শুরু হয়েছিল, বারোটায় ছুটি হয়ে গেছে। তারপর লাইব্রেরিতে ঘণ্টা তিনেক নোট নিয়ে হস্টেলে ফিরে শুয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।

শঙ্করণ আর বিকাশের আজ পাঁচটা পর্যন্ত টানা ক্লাশ। তারপর লাইব্রেরি ওয়ার্ক সেরে হস্টেলে ফিরতে ফিরতে নির্ঘাত সন্ধে হয়ে যাবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল, সন্দীপের খেয়াল নেই। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়তে ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে। তারপর বিছানা থেকে নেমে ব্যস্তভাবে ছিটকিনি খুলেই দারুণ অবাক হয়ে গেল। অমরনাথ বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আকাশের কোথাও সূর্যটা নেই। জাল গুটানোর মতো কেউ যেন দিনের শেষ আলোটুকু দ্রুত টেনে নিচ্ছে। একটু পরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে। বিমূঢ়ের মতো সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি !'

'হ্যাঁ, আমিই।' অমরনাথ হাসলেন, 'তোমরা যখন আমাদের বয়কট করেছ তখন আমাকেই আসতে হল। আজ রাত্তিরে বিকাশ তুমি আর তোমাদের কে এক সাউথ ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড আছে, সবাই আমাদের ওখানে খাবে। তোমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।' তারপর ঘরে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আর দু'জন কোথায়?'

'ওরা এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি। আপনি ভেতরে আসুন—'

'না, সোনা গাড়িতে বসে আছে। আমি ওখানে গিয়ে তোমার জন্যে ওয়েট করছি। চট করে পোশাক-টোশাক পাল্টে চলে এসো। দেরি করবে না।'

এভাবে বিকাশকে ছাড়া অমরনাথের সঙ্গে যেতে অস্বস্তি হচ্ছে সন্দীপের। দ্বিধান্বিতভাবে সে বলল, 'কিন্তু বিকাশরা?'

'ওদের জন্য তোমাদের হস্টেলের অফিসে একটা মেসেজ রেখে যাচ্ছি, ওটা পেলেই যেন আমাদের ওখানে চলে যায়।' বলে আর দাঁড়ালেন না অমরনাথ, বারান্দার শেষ মাথায় নিচে নামার সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন।

অমরনাথের দীর্ঘ টান টান চেহারা, তাকানো এবং কথা বলার ভঙ্গিতে এমন একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাতে তাঁর মুখের ওপর না বলা যায় না। কয়েক মিনিটের মধ্যে পোশাক বদলে ঘরে তালা লাগিয়ে নিচে নেমে এলো সন্দীপ। হস্টেলের অফিসে ঘরের চাবিটা জমা দিয়ে বাইরে আসতেই দেখতে পেল, রাস্তার একধারে পুরনো মডেলের একটা প্রকাণ্ড ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেটার ফ্রন্ট সীটে ড্রাইভার আর অমরনাথ, পিছনের সীটে একা সোনালী। ফ্রন্ট সীটে বাঁদিকের জানালার ধার ঘেঁসে না বসতে পারলে গাড়ি চড়ে আনন্দ পান না অমরনাথ। ওটা তাঁর বরাবরের অভ্যাস।

সন্দীপকে দেখে অমরনাথ বললেন, 'উঠে পড়, উঠে পড়—'

উঠতে হলে ব্যাক সীটেই উঠতে হবে। ফ্রন্ট সীটে আরো একজন অবশ্যই বসতে পারে। কিন্তু অমরনাথ নেমে জায়গা করে না দিলে ওঠা

অসম্ভব। সন্দীপ দাঁড়িয়ে রইল।

অমরনাথ কিছু একটা আন্দাজ করলেন। বললেন, 'ফ্রন্ট সীট আমি ছাড়তে পারব না।' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে পিছন দিকের দরজা খুলে দিলেন, 'ওঠ। সোনা বাঘ ভাল্লুক না, আনটাচেব্‌লও না—'

নিরুপায় সন্দীপকে ব্যাক সীটে উঠে বসতে হল। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার স্টার্ট দিল। ওল্ড বালিগঞ্জের দিকে যেতে যেতে এলোমেলো দু-একটা কথা বললেন অমরনাথ। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে, বাড়ির চিঠি এসেছে কিনা, মা-বাবা কেমন আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দীপ উত্তর দিয়ে গেল কিন্তু নিজের থেকে কোন কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করল না।

গড়িয়াহাট ব্রিজের মাথায় উঠবার পর অমরনাথ চুপ করে গেলেন। এই মুহূর্তে তাঁর হয়তো আর কিছুই জানবার ছিল না। সন্দীপ জানালার বাইরে তাকিয়ে ঝাপসা আকাশের নীচে এই শহরের বাড়ি ঘর, স্কাইলাইন থেকে শুরু করে নানা দৃশ্যাবলী দেখতে লাগল।

হঠাৎ চাপা গলায় সোনালী ডেকে উঠল, 'সন্দীপদা—'

চমকে ঘাড় ফেরাল সন্দীপ। সোনালী এবার বলল, 'আমাদের বাড়ি আসেন না কেন?'

সন্দীপ বলল, 'পড়াশোনার ভীষণ প্রেসার পড়েছে। ক্লাশ থাকে। তাই—'

'সব সময়ই পড়েন নাকি? রবিবারও ক্লাশ থাকে?'

'না, মানে—'

চোখের কোণ দিয়ে অমরনাথকে দেখতে দেখতে আরেকটু কাছে এগিয়ে আসে সোনালী। গলার স্বর আরো নামিয়ে দেয়, 'রোজই ভাবি, আপনি আসবেন। কিন্তু আসেন না—'

অস্পষ্টভাবে কী বলতে চেষ্টা করে সন্দীপ কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না।

সোনালী এবার বলে, 'আমার ভীষণ খারাপ লাগে—'

তার গলার স্বরে এমন কিছু রয়েছে যা সন্দীপের বুকের ভেতর ঢেউ

তুলে দেয়। দ্রুত মুখ ফিরিয়ে সোনালীর দিকে তাকায় সে। দেখতে পায় গভীর চোখে মেয়েটা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

কেউ আর চোখ ফেরাতে পারে না। সন্দীপ এবং সোনালী পরস্পরের দিকেই তাকিয়ে থাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরনো মডেলের ফোর্ড সেই গথিক স্ট্রাকচারের বাড়িটায় ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধে নেমে যায়।

গাড়ি থেকে নেমে তিনজনে সোজা ড্রইং রুমে চলে এলো। মমতা এখানেই বসে আছেন। খুব সম্ভব ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। সন্দীপকে দেখে স্নিগ্ধ হাসলেন, 'ছেলেকে ধরে না আনলে বুঝি আসতে নেই?'

কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কিছু একটা বলল সন্দীপ কিন্তু তা শোনা গেল না।

মমতা এবার বললেন, 'বোস বাবা, বোস—' বলেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুধিষ্ঠির যুধিষ্ঠির, ওরা এসে গেছে। চা নিয়ে এস।'

কয়েক মিনিটের ভেতর চা-টা এসে গেল। খেতে খেতে নানা রকম এলোমেলো গল্প হতে লাগল। অমরনাথ কিন্তু সন্দীপের কাছে থাকলেন না। চায়ের কাপ হাতে করে খানিকটা দূরে টেলিফোন নিয়ে বসলেন। বারকয়েক এনগেজ্ড টোন পাবার পর শেষ পর্যন্ত বিধুশেখরকে ধরতে পারলেন।

আজ যে রাত্তিরে খাওয়াবার জন্য এক রকম জোর করেই সন্দীপকে ধরে এনেছেন সেটা পূর্ব-পরিকল্পিত। গেল এক মাস ধরে রোজ একবার করে বিধুশেখরের শরীরের খবর নিয়েছেন অমরনাথ। কিন্তু একটা দিনও তিনি সুস্থ থাকেননি। আজ যদি প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ড ট্রাব্‌ল দেয় কাল কিডনি কাবু করে ফেলে। পরশু হয়তো নিউর‍্যাল্‌জিক পেইন চাগিয়ে ওঠে, তার পরের দিন হার্টের বীট বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। এইভাবে চলতে চলতে আজই প্রথম সকাল থেকে কমপ্লীট সুস্থ

বোধ করছেন বিধুশেখর।

অন্য দিন অমরনাথকেই ফোন-টোন করে খোঁজখবর নিতে হয়। আজ উল্টো। বিধুশেখরই সকালে উঠে ফোন করে জানিয়েছেন, তিনি পুরোপুরি ফিট ; সন্দীপকে আজ আনানো যেতে পারে।

বিধুশেখরের শরীর পাহাড়ী জায়গার বর্ষার মতো। এই রোদ, এই বৃষ্টি। তাঁর শরীরও বেলা ন'টায় সুস্থ থাকলে এগারোটায় যে খারাপ হবে না, এমন কোন গ্যারান্টি নেই। তাই দু'ঘণ্টা পর পর ফোন করে যখন অমরনাথ কনফার্মড হলেন, বিধুশেখরের শরীর আজ আর কোন ভাবেই গোলমাল করবে না তখন রাতে কয়েকজনের খাওয়ার ব্যবস্থা করে সন্দীপকে তার হস্টেল থেকে আনতে গেলেন। বিধুশেখরের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, সন্দীপ এলেই তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয় ; তিনিও আসবেন।

অমরনাথ ফোনের ভেতর মুখটা গুঁজে দিয়ে আস্তে করে বললেন, 'ছেলেটা এসে গেছে।' বলে চোখের কোণ দিয়ে সন্দীপদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। সন্দীপকে নিয়ে যে পরিকল্পনা করেছেন সেটা তিনি গোপনই রাখতে চাইছেন।

বিধুশেখর বললেন, 'এসে গেছে? গুড—'

'গাড়ি পাঠিয়ে দেব?'

'এক ঘণ্টা পর পাঠিও। আমি রাতের খাওয়াটা চুকিয়ে যাব।'

'না-না, তুমি এখানে খাবে।'

'আমার খাওয়ার অনেক রেস্ট্রিক্সন। তুমি তো সবই জানো।'

'সব জানি। তুমি যা খাও মমতা তার ব্যবস্থা করেছে। কোন ভয় নেই।'

'আজ থাক ভাই।'

'আমি মমতাকে ফোন দিচ্ছি। যা বোঝাবার তাকে বোঝাও।'

'ফ্রম ফ্রাইং প্যান টু ফায়ার হতে চাই না। ঠিক আছে, আমি তোমার ওখানে খাব। তবে জোরজার করে বেশি খাইও না। মারা পড়ব।'

'তাই হবে। তোমাকে মেরে আমার মেটিরিয়াল বা স্পিরিচুয়াল কোন রকম লাভই নেই।' বলে অমরনাথ হাসলেন।

বিধুশেখরও উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, 'এখন ছ'টা বাজে। সাড়ে ছ'টায় আমার একটা ইঞ্জেকসান নিতে হবে। তুমি পৌনে সাতটায় গাড়ি পাঠিও।'

টেলিফোন নামিয়ে সন্দীপদের কাছে এসে বসলেন অমরনাথ। যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'তুই ড্রাইভারকে গিয়ে বল, বিধুবাবুকে আনতে যেতে হবে। ঠিক পৌনে সাতটায় গাড়ি নিয়ে সে যেন চলে যায়।'

'আচ্ছা—' যুধিষ্ঠির ঘাড় কাত করে চলে গেল।

বিধুশেখরের আসার আগেই শঙ্করণ আর বিকাশ এসে গেল। শঙ্করণ আগে কখনও এ বাড়িতে আসেনি। তার সঙ্গে অমরনাথদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তক্ষুণি বিকাশ এবং তার জন্য চা কেক কাজুবাদাম-টাদাম এলো। অমরনাথ মমতা এবং সোনালী শঙ্করণের মা-বাবা, ভাই-বোন, অন্ধ্রে তাদের বাড়ি-টাড়ি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সে কাজ চালাবার মতো বাঙলা শিখে নিয়েছে দেখে সবাই খুশি।

গল্প-টল্পর ফাঁকে এক সময় বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'মেসো, আজ রাত্তিরে হঠাৎ আমাদের নেমন্তন হল। অকেসানটা কী?'

অমরনাথ বললেন, 'অকেসান আবার কী। ইচ্ছা হলো সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাব। আর তোরা তো এভাবে জোরজার করে না আনলে আসবি না।'

বিকাশ হাসল।

মমতা বললেন, 'এত বড় বাড়ি। আমরা দুটো মাত্র প্রাণী। সোনাটা

আসায় তবু দুটো কথা বলতে পারছি। মাঝে মাঝে তোরা এলে কত ভাল যে লাগে!'

ওদের কথাবার্তার ভেতর বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অমরনাথ উঠতে উঠতে বললেন, 'ঐ বোধ হয় বিধু এলো। ওকে নিয়ে আসি।'

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'বিধু কে?'

'আমার এক বন্ধু। ভেরি ইন্টারেস্টিং পারসন। এক্ষুণি আলাপ করিয়ে দেব।' বলে আর দাঁড়ালেন না অমরনাথ; ড্রইং রুমের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট দুয়েক বাদে যখন তিনি ফিরে এলেন, সঙ্গে রোগা অ্যানিমিক চেহারার একজন বৃদ্ধ। রোগে ভুগে ভুগে গায়ের রঙ ফ্যাকাসে; চোখ গর্তে ঢোকানো। মিশরের ম্যমিরা কি এ রকমই দেখতে হয়?

একটা সোফায় বিধুশেখরকে বসিয়ে অমরনাথ তাঁর মুখোমুখি বসলেন। তারপর সন্দীপদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার বন্ধু; মস্ত পণ্ডিত লোক। নানারকম গূঢ় বিদ্যা নিয়ে চর্চা করেন।'

যে যে গুপ্ত বিষয়ে বিধুশেখরের কৌতূহল এবং জ্ঞান আছে সে সব নিয়ে গল্প শুরু করে দিলেন তিনি। চেহারায় শুকনো ম্যমি হলে কী হবে, তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটা ভীষণ মজার। অনর্গল গল্প করে যাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু চোখ দুটো বার বার সন্দীপের দিকে চলে যাচ্ছে তাঁর কিন্তু ছেলেটার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

নানা কথার ফাঁকে অমরনাথ এক সময় বললেন, 'রাত্তিরে তুমি ক'টায় খাও, বলে দিও। সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'আচ্ছা—' বলেই এই ড্রইং রুমের দেয়ালে চৌকো বিরাট ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বিধুশেখর, 'ওহে অমর, আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী। আমি ঠিক আটটায় খাই।'

অমরনাথ কিছু বলার আগেই মমতা উঠে পড়লেন। বললেন, 'আমি

খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।' বলে সোনালীকে নিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজলে সোনালী আবার নীচে নেমে এসে বলল, 'আপনারা ওপরে চলুন। খাবার দেওয়া হয়েছে।' সবাই উঠে পড়ল।

ডাইনিং রুমটা দোতলায়। একসঙ্গে তিরিশজন খেতে পারে। এ রকম একটা টেবল পাতা রয়েছে সেখানে। সেটার ওপর সাদা ধবধবে চাদর। টেবলটাকে ঘরে সিংহসনের স্টাইলে সার সার গদিমোড়া ফ্যাশনেব্‌ল চেয়ার।

আজ নিয়ে এ বাড়িতে তিনদিন এলো সন্দীপ। কিন্তু ড্রইং রুম ছাড়া আর কোথাও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এই প্রথম সে এলো দোতলায়।

ডাইনিং রুমে পা দিতেই চোখের সামনে সেই সিনেমার স্লাইড ফুটে উঠতে লাগল। এ ঘরটায় চারটে দরজা। সন্দীপ জানে বাঁদিকের দরজাটা দিয়ে বেরুলেই কিচেন। সামনের দরজার ওপারে ব্যালকনি। ডানদিকে রয়েছে ছটো দরজা। একটা দরজা দিয়ে বেরুলে লম্বা বারান্দা। বারান্দার বাঁদিক ধরে পর পর ঘর। অন্য দরজাটা দিয়ে বেরুলেই বাড়ির পেছন দিকে নামবার ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

বিরাট টেবলের এক প্রান্তে অমরনাথ আর বিধুশেখর পাশাপাশি বসলেন। তাঁদের ডানদিকে কোণাকুণি শঙ্করণ এবং সন্দীপ। সন্দীপদের মুখোমুখি বিকাশ সোনালী। মমতা বসলেন না। যুধিষ্ঠির কিচেন থেকে নানা আকারের পাত্রে টেবলের অন্য প্রান্তে প্রচুর খাবার-দাবার এনে রাখছে। মমতা নিজের হাতে সবাইকে খেতে দেবেন।

প্রত্যেকের সামনেই নানা মাপের প্লেট বাটি গেলাস কাঁটাচামচ এবং ন্যাপকিন সাজানো রয়েছে। মমতা একসময় সার্ভ করতে শুরু করলেন। খাওয়ার আয়োজন চমৎকার। ফ্রায়েড রাইস, লুচি, মাছের ফ্রাই, কালিয়া, মুরগির মাংস, চাটনি, দই এবং রাজভোগ। তবে

বিধুশেখরের জন্য অন্য ব্যবস্থা। সুজির রুটি, সুপ, রুই মাছের পাতলা ঝোল, ঝালমশলা ছাড়া মুরগি। দই মিষ্টি তাঁর বারণ।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে গল্পও চলছিল। বিকাশ সোনালী এবং শঙ্করণ তাদের কলেজ, বিভিন্ন অধ্যাপকের পড়াবার ভঙ্গি এবং তাঁদের মুদ্রাদোষ নিয়ে নানা রকম মজার মজার কথা বলছিল আর হাসছিল। সন্দীপও ওদের সঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, সবই ঠিক—কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক।

ওধারে বিধুশেখর আর অমরনাথ কথা বলছিলেন। তাঁদের গলা এত চাপা এবং নীচু যে অন্য কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

বিধুশেখর বললেন, 'পুলিশের ফেউটাকে সন্দীপের পিছনে লাগিয়াছিলে?'

অমরনাথ বললেন, 'সিওর। প্রায় এক মাস হয়ে গেল।'

'কিছু খবর-টবর পেলে?'

'রোজই সন্দীপের ব্যাপারে রিপোর্ট পাই। সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। পড়াশোনা, লাইব্রেরি ওয়াক, ক্লাশ, এ সব ছাড়া ছেলেটা আর কিছু জানে বলে মনে হয় না। এই এক মাসের ভেতর কলেজ আর হস্টেলের বাইরে মোটে চারদিন বেড়াতে বেরিয়েছিল। আনোয়ার শা রোড ধরে টালিগঞ্জের ট্রামডিপো পর্যন্ত গিয়ে আবার হস্টেলে ফিরে এসেছিল। তাও একলা না; সঙ্গে বিকাশ আর শঙ্করণ ছিল।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে ওদিকটা বেশ ক্লীন।'

'হ্যাঁ, দেখ এবার ছেলেটার সঙ্গে কথাবার্তা বলে—তুমি কিছু বার করতে পারো কিনা।'

বিধুশেখর উত্তর দিলেন না। সুপ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রুটি ছিঁড়ে মাছের ঝোলে ভেজাতে ভেজাতে সন্দীপের দিকে তাকালেন তিনি। আস্তে করে তাকে ডাকলেন। সন্দীপ এধারে মুখ ফেরাতেই বললেন, 'অমরের কাছে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। শুনতে শুনতে মনে হয়েছে, 'তোমার সুপারন্যাচারাল পাওয়ার আছে।'

এ জাতীয় কথা অমরনাথের মুখে আগেই শুনেছে সন্দীপ। তাঁকে

সে যা উত্তর দিয়েছিল বিধুশেখরকে সেই একই কথা বলল। অর্থাৎ অলৌকিক কোন ক্ষমতাই তার নেই। মাঝে মাঝে সিনেমা স্লাইডের মতো অনেক ছবি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পরে দেখা গেছে সেগুলো সব সত্যি।

বিধুশেখর একটু চিন্তা করে বললেন, 'তুমি নাকি জয়ন্তর ফোটো আর যুধিষ্ঠিরকে দেখে ওদের নাম বলে দিয়েছ?'

আস্তে মাথা নাড়াল সন্দীপ।—'হ্যাঁ।'

বিধুশেখর এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সন্দীপ, জয়ন্তর নাম তো তুমি বলে দিয়েছ। ওর সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারো? এই যেমন ধর, গায়ের রঙ, হাইট, স্পেশাল কোন মার্ক—এই সব?'

সন্দীপের খাওয়া থেমে গিয়েছিল। স্থির চোখে দূরমনস্কর মতো অনেকক্ষণ খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলতে শুরু করল, 'জয়ন্তর গায়ের রঙ ফর্সাও না, কালোও না, দুয়ের মাঝামাঝি। হাইট ফাইভ ফিট সিক্স ইঞ্চেস। বুকের বাঁদিকে লাল রঙের একটা জড়ুল ছিল—'

বিধুশেখর এবং অমরনাথ মমতার দিকে তাকালেন, 'মিলছে?'

দু'জনেরই বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। তাঁরা একই সঙ্গে বললেন, 'সব মিলেছে।'

আবার বিধুশেখর সন্দীপের দিকে ফিরলেন, 'তুমি তো জানোই, জয়ন্ত মারা গেছে। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারবে?'

'পারব। তাকে মার্ডার করা হয়েছে।'

মমতার হাতে স্টেনলেশ স্টীলের ওভাল শেপের একটা থালায় ফ্রায়েড রাইস বোঝাই ছিল। হাত থেকে থালাটা মেঝেতে পড়ে গেল। ঝন ঝন করে একটা ধাতব শব্দ উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। হাতের ফাঁক দিয়ে তাঁর কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। ওধারে প্লেটের ওপর হাত থেমে গিয়েছিল অমরনাথের। তাঁর দু চোখও জলে ভরে উঠতে লাগল।

বিধুশেখর ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে কোথায় জয়ন্তকে মার্ডার করা হয়েছিল, বলা সম্ভব ?'

সন্দীপ বলল, 'সম্ভব। এম. এ. পরীক্ষার পর জয়ন্ত দিল্লীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সে যখন ফিরে আসছিল, অনেক রাত্রে পলাশপুর স্টেশনের কাছে তাকে ছুরি মেরে খুন করে ফেলে দেওয়া হয়।'

বিধুশেখর কিছু বলার আগেই অবরুদ্ধ গলায় অমরনাথ বলে উঠলেন, 'কারেক্ট, কারেক্ট। আমার লাইফে অনেক ক্রিমিন্যাল কেস এসেছে। তার সবগুলোই সল্‌ভ্‌ করেছি, শুধু নিজের ছেলের এই মার্ডার কেসটা ছাড়া। এই একটা খুনীকেই আমি শুধু ধরতে পারিনি। নিজের ছেলের মার্ডারারকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারলাম না, এ দুঃখ মরলেও আমার যাবে না।' বলতে বলতে বাঁ হাত দিয়ে সন্দীপের একটা হাত চেপে ধরলেন, 'জয়ন্তর খুনী কে, বলতে পারো সন্দীপ ? তুমি—একমাত্র তুমিই পারবে। যদি সেই শয়তানটাকে ধরিয়ে দিতে পারো, সারা জীবন তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।'

সেদিন রাত্রে দিল্লী-ক্যালকাটা মেলের একটা ফাঁকা ফার্স্ট ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে যে লোকটা জয়ন্তকে ছুরি মেরে পলাশপুর স্টেশনের কাছে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল তার মুখটা ছবির মতোই দেখতে পায় সন্দীপ। শুধু অদৃশ্য সিনেমা স্লাইডেই না, পরেও সেই লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় ? বেনারস ? লক্ষ্ণৌ ? এলাহাবাদ ? সন্দীপ মনে করতে পারে না। তবে সেই খুনীটা ছিল অল্পবয়সী, তিরিশ বত্রিশের বেশি তার বয়স হবে না। মোটা গোঁফ ছিল তার, জোড়া ভুরু, কটা চোখ, ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মোষের মতো চেহারা। পরে যাকে দেখেছে তার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, তবে চেহারার আদল একই। সন্দীপ জোরে শ্বাস টেনে বলল, 'খুনীটার নাম-টাম বলতে পারব না। তবে তাকে দেখলে চিনিয়ে দিতে পারব।'

অমরনাথ হতাশ গলায় বললেন, 'এই প্রকাণ্ড দেশে কোটি কোটি মানুষ। তার ভেতর সেই শয়তানটাকে কোথায় পাবে যে আইডেনটিফাই

করবে। জয়ন্ত মারা গেছে, কতদিন হয়ে গেল। তার মার্ডারার কি আর বেঁচে আছে?'

আচমকা সন্দীপ বলে উঠল, 'সে বেঁচে আছে। আমার মনে হয়, তাকে আমি দেখেছি।'

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন অমরনাথ, 'কোথায়?'

সন্দীপ বলল, 'বলতে পারব না। তবে দেখেছি যে তার মধ্যে ভুল নেই।'

বিধুশেখর জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন আগে দেখেছ?'

'খুব বেশিদিন না, ছ'আট মাসের মধ্যে।'

'এর মধ্যে তুমি কোথায় কোথায় ছিলে?'

'এলাহাবাদ আর বেনারসেই বেশির ভাগটা। কিছু দিন লক্ষ্ণৌতেও ছিলাম আর বি. এস. সি পরীক্ষার পর একবার দিল্লী গিয়েছিলাম।'

'তা হলে এই চারটে জায়গার কোথাও নিশ্চয়ই লোকটাকে দেখেছ?'

'হবে।'

'একটু মনে করতে চেষ্টা কোরো তো।'

'করব।'

এদিকে অন্য সবাই খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে আচ্ছন্নের মতো সন্দীপের কথা শুনে যাচ্ছিল। এবার তাদের দিকে নজর পড়ল অমরনাথের। ব্যস্তভাবে বললেন, 'এ কী, তোমরা কেউ কিছু খাচ্ছ না যে—খাও, খাও।'

মেঝেতে মমতার হাত থেকে পড়ে যাওয়া ফ্রায়েড রাইস ছড়িয়ে আছে। একটা চাকরকে ডেকে সেগুলো সাফ করালেন।

সবাই আবার খেতে শুরু করল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর অমরনাথ সন্দীপকে বললেন, 'তোমাকে জয়ন্তর ব্যাপারে আর দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

সন্দীপ বলল, 'কী?'

'ওর শেষ জন্মদিনে আমি ওকে একটা জিনিস দিয়েছিলাম। কী

বলতে পারো ?'

'পারি। একটা দামী হীরের আংটি। পার্ক স্ট্রীটের একটি নামকরা জুয়েলারের দোকান থেকে কেনা হয়েছিল।'

'ঠিক।'

'ওর মৃত্যুর পর সেই আংটিটা আমরা পাইনি। অথচ আমার মনে আছে, ও যখন দিল্লী গিয়েছিল দামী জিনিস বলে আংটিটা সঙ্গে নেয়নি।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল সন্দীপ। তারপর বলল, 'আংটিটা কোথায় আছে, এক্ষুনি বলতে পারব না।'

অমরনাথ বললেন, 'আরো একটা জিনিস জয়ন্তকে দিয়েছিলাম। একটা অ্যালবাম। চাকরি করতে গিয়ে মারাত্মক মারাত্মক ক'টা শত্রু আমি তৈরি করেছি। অ্যালবামে তাদের ফটো ছিল। অ্যালবামটা সে যে কোথায় রেখে গেছে, অনেক খুঁজেও বার করতে পারিনি। ওটা থাকলে তোমাকে দেখাতে পারতাম। যে খুনীটার কথা তুমি বলছ তার ফটো অ্যালবামটায় আছে কিনা।'

সন্দীপ উত্তর দিল না।

অমরনাথ ফের বললেন, 'বলতে পারো, অ্যালবামটা কোথায় আছে ?'

এবারও বেশ খানিকটা সময় চোখ কুঁচকে ভাবল সন্দীপ। কিন্তু না, সিনেমা স্লাইডে অ্যালবামটার কোন ছবিই ফুটে উঠছে না। সে বলল, 'না, পারব না। তবে—'

'তবে কী ?' আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকলেন অমরনাথ।

সন্দীপ বলল, 'আপনাদের বাড়িটা যদি ভাল করে দেখতে দেন, মনে হয় আংটি আর অ্যালবাম খুঁজে বার করতে পারব।'

'অবশ্যই। খাওয়া-দাওয়ার পর তুমি খোঁজ না।'

'আজ না। পরে আসব। হয়তো একদিনে হবে না ; বেশ কয়েক দিন সময় লেগে যাবে।'

'যে ক'দিন ইচ্ছে সময় নাও। আর এ বাড়ির দরজা সব সময় তোমার জন্যে খোলা রইল। যখন খুশি এখানে আসবে, যে ঘরে

ইচ্ছে সে ঘরে যাবে। এমন কি যদি অন্যভাবে না নাও, একটা কথা বলতে পারি—'

'কী?'

'যে ক'দিন অ্যালবাম আর আংটিটা না পাচ্ছ, আমাদের বাড়িতে তুমি থাকতেও পারো। এখান থেকেই ক্লাশ করবে।'

সন্দীপ বিব্রত ভাবে বলল, 'ক্ষমা করবেন। আমি হস্টেলেই থাকব।'

অমরনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, এ বাড়িতে এসে থাকার কথা বলাটা ঠিক হয়নি। এতটা আশা করা যায় না। বললেন, 'ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু খুব শিগগিরই আবার তোমাকে আসতে হবে।'

'আচ্ছা—'

খাওয়া-দাওয়া চুকতে চুকতে ন'টা বেজে গেল।

অমরনাথ বললেন, 'চল, নিচে ড্রইং রুমে গিয়ে আরেকটু বসি। দশটা বাজলে আমি সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

বিধুশেখর বললেন, 'আমি কিন্তু ভাই আর বসতে পারব না। ডাক্তারের অ্যাডভাইস, সাড়ে ন'টায় আমাকে শুয়ে পড়তেই হবে।'

'তাহলে তোমাকে আটকাব না।'

নিচে এসে সন্দীপ বিকাশ শঙ্করণ সোনালী আর মমতা বসলেন। মমতার এখনও খাওয়া হয়নি। রাত এগারোটার আগে তাঁর খাওয়ার অভ্যাস নেই। বিধুশেখর আর অমরনাথ বসলেন না। বন্ধুকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ বাইরে চলে গেলেন। এই যাওয়ার উদ্দেশ্য আড়ালে সন্দীপ সম্পর্কে বিধুশেখরের প্রতিক্রিয়া জেনে নেওয়া।

বিশাল বারান্দা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচের রাস্তায় নামতে নামতে অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটাকে কী রকম মনে হল?'

বিধুশেখর বললেন, 'অদ্ভুত। আমার বাহাত্তর বছরের লাইফে এ রকম দেখিনি।'

'ওর মুখে যা-যা শুনলে আগে থেকে খোঁজখবর নিয়ে তা বলা কি

সম্ভব ?'

'ইমপসিব্‌ল। যতই খোঁজখবর নিক, অত বছর আগের কথা এত ডিটেলে বলা যায় না।'

'তাহলে ?'

ওঁরা লন এবং ফুল বাগানের মাঝখানের রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। একটু দূরেই সেই পুরনো মডেলের ফোর্ড গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিধুশেখর বললেন, 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে ও জাতিস্মর।'

'জাতিস্মর মানে ?' জিজ্ঞাসু চোখে অমরনাথ বন্ধুর দিকে তাকালেন।

'যে পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে।'

'বল কী হে !'

'ঠিকই বলছি। আমার বিশ্বাস—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন বিধুশেখর।

অমরনাথ বললেন, 'কী হল, চুপ করে গেলে কেন ? কী বিশ্বাস তোমার ?'

ওঁরা ফোর্ড গাড়িটার কাছে এসে গিয়েছিলেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বিধুশেখর বললেন, 'সন্দীপ হীরের আংটি আর তোমার সেই অ্যালবামটা খুঁজে বার করে দিক। তখন বলব।'

সেই যে অমরনাথ সন্দীপকে তার হস্টেল থেকে ধরে এনেছিলেন, তারপর থেকে সে প্রায়ই ওল্ড বালিগঞ্জের সেই বাড়িটায় আসতে লাগল। সপ্তাহে অন্তত দু'বার করে। নিজের থেকেই যে সব সময় আসে তা নয়, অমরনাথ মাঝে মাঝেই গাড়ি পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসেন। কোন কোন দিন বিকাশ সঙ্গে যায় না। বেশির ভাগ দিন সন্দীপকে একলাই যেতে হয়। অবশ্য ক্লাশ বা লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে সে কখনও যায় না।

ও বাড়িতে গেলে মমতা আর অমরনাথের সঙ্গে দেখা তো হয়ই, সোনালীর সঙ্গেও হয়। কোন কোন দিন বিকেলের দিকে গেলে সোনালীকে অবশ্য বাড়িতে পাওয়া যায় না। সে তখন থাকে কলেজে। তবে সন্দীপ বাড়িতে থাকতে থাকতেই সোনালী ফিরে আসে।

ওখানে গেলেই খুব যত্ন করেন মমতা আর অমরনাথ। সোনালী তাকে চা এবং নানা রকম খাবার খাওয়ায়। খাওয়া হয়ে গেলে অমরনাথ বলেন, 'এবার বাড়িটা ঘুরে দেখ।' অর্থাৎ অ্যালবাম আর হীরের আংটিটা খুঁজতে বলেন।

সন্দীপ উঠে পড়ে। তারপর বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। সেই সময় সোনালী সন্দীপের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরতে থাকে।

নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সোনালী আর সন্দীপ অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। সন্দীপ লক্ষ্য করেছে, আজকাল সোনালী আর তাকে আপনি করে বলে না। 'সন্দীপদা' অবশ্য বলে ; সেই সঙ্গে তুমি। আরো একটা ব্যাপার নজরে পড়েছে, তার সম্বন্ধে মেয়েটার দারুণ আগ্রহ। সে আসবে বলে মেয়েটা যেন সর্বক্ষণ উন্মুখ হয়ে থাকে। সোনালীকে তার ভাল লাগে ঠিকই কিন্তু তার চাইতে এই গথিক স্ট্রাকচারের প্রকাণ্ড বাড়ি, লন, ফুলবাগান, বড় বড় ঘর, এ সবের আকর্ষণ তার কাছে অনেক, অনেক বেশি।

অমরনাথও ওদের ঘনিষ্ঠতাটা লক্ষ্য করেছেন। তিনি বোঝেন, সোনালীর দিক থেকেই আগ্রহটা বেশি। ওদের দেখতে দেখতে একটা সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় এসেছে। কারণও আছে। প্রায়ই নর্থ বেঙ্গল থেকে সোনালীর মা-বাবা চিঠি লিখছেন। মেয়েকে এখানে রেখে পড়াবার জন্য অমরনাথ এবং মমতার কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সোনালী এক রকম অমরনাথেরই মেয়ে। এখন তার ব্যাপারে আরেকটু উপকার করতে হবে। সোনালীর মা-বাবার ইচ্ছা, এখনই মেয়ের জন্য একটি সুপাত্র ঠিক করে রাখা। তেমন হলে তাড়াতাড়িই বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা হবে। মেয়েকে যখন পরের ঘরে পাঠাতেই হবে তখন দেরি করার অর্থ হয় না।

বিয়ের পরও বহু মেয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। এখন এই সুপাত্রটি অমরনাথকে যোগাড় করে দিতে হবে।

অমরনাথ মোটামুটি ভেবেই রেখেছেন, সন্দীপকে অরেকটু দেখবেন। এমনিতে ছেলেটা খুবই ভাল। সৎ বিনয়ী ভদ্র। তবে এক্ষুণি বিয়ের কথা বললে ও নিশ্চয়ই রাজী হবে না। কায়দা করে সন্দীপের বেনারসের ঠিকানা জেনে নিয়ে হুট করে একবার কাশী চলে যাবেন এবং ওর মা-বাবার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করে রাখবেন। সন্দীপ সম্পর্কে চিঠিপত্রে সোনালীর মা-বাবাকে তিনি সামান্য আভাস দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন এ ব্যাপারে বিকাশকে ওঁরা যেন কিছু না লেখেন। জানাজানি হয়ে গেলে লজ্জায় সঙ্কোচে সন্দীপ হয়তো এ বাড়িতে আর আসবে না।

সন্দীপ এবং সোনালীকে ঘিরে ভবিষ্যতের সেই পরিকল্পনাটা অনেক দূরের ব্যাপার। তার আগে যেটা দরকার তা হল জয়ন্তর মার্ডারারকে খুঁজে বার করা। যেভাবেই হোক খুনীকে ধরার একটা ক্লু সন্দীপকে দিয়ে বার করতেই হবে। জীবনে সব জটিল কেসেরই সমাধান হয়েছে তাঁর হাতে। শুধু নিজের সন্তানের হত্যাকারীকেই ধরতে পারেননি। তাঁর দীর্ঘ উজ্জ্বল কেরিয়ারে এই একটাই ফেলিওর। এই ব্যর্থতার জন্য তাঁর দুঃখ এবং আক্ষেপের শেষ নেই।

আজ ক্লাশ ছুটির পর নিজে থেকেই ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে চলে এসেছিল সন্দীপ। অমরনাথ, মমতা তো ছিলেনই, সোনালীকেও পাওয়া গিয়েছিল। আজ আর সে কলেজে যায়নি। কী একটা কারণে আজ ওদের ছুটি।

চা-টা খাওয়ার পর সন্দীপ এ ঘরে সে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রথমে একতলায়, তারপর দোতলায় উঠে এলো সে। তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো সোনালীও ঘুরছে।

দোতলায় এসে প্রথমে গেল ডাইনিং রুমে। সেখান থেকে বসবার ঘরে। দোতলাতেও একটা ড্রইং রুম রয়েছে। এখানে সোফা, সেণ্টার

টেবল, মেঝেতে কার্পেট, ডিভান, ডিসটেম্পার-করা দেয়ালে কিছু ছবি, সীলিং ফ্যান-ট্যান ছাড়া আর কিছুই নেই।

অদৃশ্য সিনেমা স্লাইডে যে সব ছবি বার বার সন্দীপ দেখে আসছে তার মধ্যে এই ড্রইং রুমটাও রয়েছে। সেই ছবির সঙ্গে এটার কোন তফাত নেই। অবিকল এক। পার্থক্যের মধ্যে ঘরটার রঙ-টঙ হয়তো বদলে গেছে।

খানিকক্ষণ সব কিছু দেখার পর সন্দীপ সটান চলে এলো দক্ষিণ দিকে জয়ন্তর ঘরে। এ ঘরটার ছবিও ছেলেবেলা থেকে কয়েক হাজার বার চোখের সামনে দেখে আসছে। তা ছাড়া সেদিন হীরের আংটি এবং অ্যালবাম খোঁজার দায়িত্ব নেবার পর থেকে এই ঘরটায় কম করে দশ বারো বার সে এসেছে কিন্তু ঐ দুটো জিনিসের চিহ্ন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাওয়ার মতো কোন ক্লু-ও কোথাও নেই।

দোতলার এই ঘরটার তুলনা হয় না। দক্ষিণ এবং পুব পুরোপুরি খোলা। অন্তত শ খানেক গজের ভেতর কোন বাড়ি-টাড়ি নেই। জানালা খুলে রাখলে ফ্যান-ট্যানের দরকার হয় না।

ঘরটা বেশ বড়ও। মেঝেতে দামী কার্পেট। মাঝখানে ফোমের গদি দেওয়া সুদৃশ্য ডাবল-বেড খাট। একধারে পড়াশোনার জন্য ছোট টেবল, চেয়ার, টেবল ল্যাম্প। সীলিংয়ে দুটো ফ্যান। একধারে দেয়ালের ভেতর বসানো আলমারি। একটা উঁচু স্ট্যাণ্ডে রেডিও, গাদা গাদা রেকর্ডের বাক্স, আরেক ধারে রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ড, স্টিরিও ইত্যাদি ইত্যাদি।

অদৃশ্য পর্দায় ছেলেবেলা থেকে কতবার যে এই ঘরটা সন্দীপ দেখেছে তার হিসেব নেই। সবই এখানে আছে কিন্তু ছবির সঙ্গে মিলিয়ে কী একটা যেন নেই। কী নেই? কী নেই? দশ বারো দিন যতবার সে এখানে এসেছে ততবারই ভাবতে চেষ্টা করেছে সন্দীপ, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারেনি।

পাশ থেকে নীচু গলায় সোনালী বলে উঠল, 'আংটিটা কোথায়

রয়েছে মনে করতে পারছ ?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল সন্দীপ। তারপর অন্য সব দিনের মতো আলমারি, রেকর্ড স্ট্যাণ্ড, খাট তন্ন তন্ন করে খুঁজল। এমন কি কার্পেট তুলেও খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু নেই, কোথাও ঐ জিনিস ছুটো নেই।

আজ নিয়ে দশ বারো দিন প্রচুর খুঁজেও যখন কিছুই হল না তখন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করতে লাগল সন্দীপ। এবং হতাশ অবসন্ন গলায় সে সোনালীকে বলল, 'চল, অন্য ঘরগুলো দেখি।'

দরজা পর্যন্ত এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল সন্দীপ। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা কথা তার মনে পড়ে গেল।

সোনালী জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ?'

সন্দীপ উত্তর না দিয়ে এক রকম দৌড়েই খাটটার কাছে চলে গেল। একদিন বেডকভারটা তুলে ফোমের বিশাল গদি উল্টে দিল।

সোনালী অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'কী করছ ?'

সন্দীপ এবারও কিছু বলল না। ফোমের গদিটা মোটা প্রিন্টেড কাপড়ের কভার দিয়ে ঢাকা। দ্রুত কভারটা খুলে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক চিঠি বেরিয়ে এলো। দেখেই বোঝা যায়, চিঠিগুলো বহুদিনের পুরনো। সেগুলোর রঙ হলদে হয়ে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে চিঠির পর চিঠি খুলে ফেলতে লাগল সন্দীপ। সবগুলোই জয়ন্তকে লেখা। আবেগে ঠাসা এই সব প্রেমপত্র লিখেছে পরমা।

পরমা! পরমা! ছেলেবেলা থেকে অদৃশ্য বায়োস্কোপের পর্দায় যে সব দৃশ্য এবং মানুষের ছবি ফুটে উঠেছে তার মধ্যে একটি কুড়ি একুশ বছরের অসাধারণ রূপসী মেয়েও রয়েছে। তার নামটা কিছুতেই এতকাল মনে করতে পারেনি সন্দীপ। এই প্রথম জানা গেল তার নাম পরমা। দ্রুত চিঠিগুলো পকেটে পুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে। পাশেই যে সোনালী রয়েছে, তার কথা এই মুহূর্তে খেয়াল নেই যেন।

ওদিকে বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে দম আটকে আসছিল সোনালীর। সেও সন্দীপের পেছন পেছন এগিয়ে এলো। বলল, 'এগুলো কার চিঠি

সন্দীপদা ?   কী লেখা আছে ওগুলোতে ?'

উত্তর না দিয়ে ঝড়ের গতিতে দোতলা থেকে নীচে ড্রইংরুমে নেমে এলো সন্দীপ আর সোনালী। সেখান থেকে বাইরের সবুজ লনে। গার্ডেন আমব্রেলার তলায় এই পড়ন্ত বিকেলে দুটো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে ছিলেন অমরনাথ এবং মমতা। ওভাবে ছেলেমেয়ে দুটোকে দৌড়ে আসতে দেখে কিছুটা চমক লাগল তাঁদের। একদৃষ্টে ওঁরা তাদের লক্ষ্য করতে লাগলেন।

কাছাকাছি এসে উত্তেজিত ভাবে সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'পরমা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন ?'

প্রথমটা মনে করতে পারলেন না অমরনাথ। বললেন, 'কে পরমা ?'

'আপনাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিল।'

'ঠিক মনে করতে পারছি না তো।'

সন্দীপ বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখুন, এর সঙ্গে আপনার ছেলে জয়ন্তর বিয়ে হবার কথা হয়েছিল কিনা—'

ওপাশের বেতের চেয়ার থেকে রুদ্ধশ্বাসে মমতা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হয়েছিল।' বলে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'পরমা হল রমু—ভূপেনের মেয়ে।'

এবার মনে পড়ে গেল অমরনাথের। দ্রুত তিনি বলে উঠলেন, 'তাই তো। রমু আর জয় একই সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। একজন আরেকজনকে পছন্দ করত। রমুর মা-বাবা, আমি আর আমার স্ত্রী সবাই ঠিক করেছিলাম দু'জনের বিয়ে দেব কিন্তু তার আগেই জয়টা চলেই গেল।' তাঁর চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে গাঢ় বিষাদ এবং দুঃখ ফুটে উঠতে লাগল।

সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'পরমা এখন কোথায় আছে বলতে পারেন ?'

অমরনাথ বললেন, 'না, ঠিক বলতে পারব না। জয় মারা যাবার দু-তিন বছর বাদে রমুর মা-বাবা ওর বিয়ে দিয়ে দেয়।'

সন্দীপ চমকে ওঠে, 'বিয়ে!'

'হ্যাঁ। কী আর করবে বল! মা-বাবা আর ক'দিন? মেয়েটার একটা ভবিষ্যৎ আছে তো।' বলে একটু চুপ করলেন অমরনাথ। তারপর বিষণ্ণ স্বরে ফের শুরু করলেন, 'ওর বিয়েতে আমাদের যাবার জন্য ভূপেন অনেক বার এসেছে, লোক পাঠিয়েছে, ফোন করেছে কিন্তু আমরা যেতে পারিনি। কী করে যাব বল? যাকে পুত্রবধূ করে আনব ভেবেছিলাম, সে অন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে, এ দৃশ্য দেখলে আমার বুক ফেটে যেত।'

যে আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটাকে ছেলেবেলা থেকে বহুবার সেই অদৃশ্য বায়োস্কোপের পর্দায় সন্দীপ দেখে আসছে, তার যে বিয়ে হতে পারে এ যেন ভাবা যায় না। পরক্ষণেই তার মনে হয়, সত্যিই তো, যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা সেই জয়ন্তর মৃত্যু হলে বাকী জীবনটা পরমার কাটে কি করে? অমরনাথ ঠিকই বলেছেন, মা-বাপ তো অমর নয়। তাঁরা চলে গেলে এ দেশে একটি মেয়েকে কে রক্ষা করবে? পরমার বিয়ে হয়ে যাওয়াই তো একান্ত স্বাভাবিক। তবু খবরটা শুনে বুকের গভীরে কোথায় যেন ধাক্কা অনুভব করে সন্দীপ।

একটু চুপচাপ। তারপর অমরনাথ ফের বলে ওঠেন, 'একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না সন্দীপ।'

সন্দীপ তার চোখের দিকে তাকায়, 'কী?'

'পরমা মানে রমুর কথা তুমি জানলে কি করে?' বলেই বিধুশেখরের মুখ মনে পড়ল অমরনাথের। তিনি বলেছিলেন, ছেলেটা জাতিস্মর।

সন্দীপ বলল, 'আমার মনে হল।' একটু চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার বলল, 'পরমা কোথায় আছে, কোনভাবেই কি জানা যায় না?'

অমরনাথ কিছু বলার আগেই কী মনে পড়ে যায় মমতার। তিনি দ্রুত বলে ওঠেন, 'রমুর মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই। তবে ওর এক দাদা আছে—প্রণবেশ। তাকে একটা ফোন করে দেখ না?'

অমরনাথ বললেন, 'প্রণবেশকে কোথায় পাব?'

'চার-পাঁচ বছর আগে আমরা রামেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রণবেশ তার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়েছিল। মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'তখন প্রণবেশ বলেছিল বালিগঞ্জে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের যে কোয়ার্টার রয়েছে সেখানে ওরা থাকে।'

'ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বড় অফিসার না ?'

'বোধ হয়। কী একটা ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের কথা যেন বলেছিল।'

অমরনাথ সন্দীপের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা এখানে একটু বস। আমি এখনই আসছি।' বেতের চেয়ার থেকে উঠে বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললেন, 'একটা চান্স নিয়ে দেখি, যদি পাওয়া যায়।'

প্রায় আধ ঘন্টা বাদে ফিরে এলেন অমরনাথ। বললেন, 'ক্যালকাটা টেলিফোন ইজ এ ভেরিটেবল নুইসেন্স। কিন্তু আজ আমাকে সে সত্যিই সাহায্য করেছে। আধঘন্টা চেষ্টার পর প্রণবেশকে ধরতে পেরেছি। এত দিন বাদে হঠাৎ ফোন করতে সে ভীষণ অবাক। যাই হোক, তার কাছ থেকে রমুর ঠিকানাও যোগাড় করেছি।'

সন্দীপ গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছে রমু ?'

'সল্ট লেকে। 'এ' সেক্টরে। ওরা ওখানে নতুন বাড়ি করে এই মাসেই উঠে গেছে। এখনও টেলিফোন পায়নি ; তাই কনট্যাক্ট করতে পারিনি।'

'ওদের বাড়ির অ্যাড্রেসটা কি ?'

পরমাদের ঠিকানা জানিয়ে দিলেন অমরনাথ।

সন্দীপ প্রায় ঘোরের ভিতর থেকেই এবার বলে উঠল, 'একবার আমাকে পরমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন ? সল্ট লেকটা কোথায়, আমি জানি না।' ছেলেবেলা থেকে অনবরত যে অদৃশ্য সিনেমা স্লাইড সে দেখে আসছে তাতে সল্ট লেকের কোন ছবি নেই।

কিছুটা দ্বিধান্বিতভাবে অমরনাথ বললেন, 'নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু—'

'কি ?'

'রমুদের ওখানে গিয়ে কি হবে ?'

'দরকার আছে। এখন নিয়ে যেতে পারেন?'

অমরনাথ ইতস্তত করতে লাগলেন। বললেন, 'অনেক দিন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। হঠাৎ চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? বরং এক কাজ করা যাক, কাল ওদের একটা খবর পাঠিয়ে দেব। দু-তিন দিন পর যাওয়া যাবে।'

সন্দীপের ইচ্ছা হচ্ছিল, এখন এই মুহূর্তেই চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এত আগ্রহ দেখানোটা ঠিক হবে না; আস্তে করে সে বলল, 'ঠিক আছে। তাই হবে। আজ তা হলে চলি—'

'এখনই যাবে? আরেকটু বসে যাও না।'

'আজ্ঞে না। কাল কলেজ আছে, ফিরে গিয়ে পড়তে বসতে হবে।'

হস্টেলে ফিরে বই-টই খুলে বসল বটে কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগল সন্দীপ। ছেলেবেলা থেকে সিনেমা শ্লাইডে দেখা একটি তরুণীর সুন্দর মুখ দুর্বোধ্য কোন আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল।

পরের দিনটাও পড়ায় মন বসাতে পারল না সন্দীপ। দশটায় বই-টই গুটিয়ে, স্নান-খাওয়া চুকিয়ে কলেজে চলে গেল। সাড়ে দশটা থেকে পর পর চারটে ক্লাশ। তারপর একটা পিরিয়ড গ্যাপ দিয়ে আরো দুটো। কিন্তু দিনের প্রথম ক্লাশটা করার পর থেকে অচেনা সল্ট লেক সিটি তাকে যেন শক্তিশালী কোন চুম্বকের মতো টানতে লাগল। পরের ক্লাশগুলো সে আর করল না। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলো বাইরের রাস্তায়। লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে সল্ট লেক যাবার বাসরুট-টুটগুলো জেনে নিল। তারপর একটা নয় নম্বর বাসে উঠে পড়ল।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে উল্টোডাঙা স্টেশনের কাছে নেমে চোদ্দ-বি বাস ধরল সন্দীপ। তারও মিনিট পনেরো কুড়ি পর বাস থেকে নেমে খুঁজে খুঁজে একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সে। বাড়িটা একেবারেই নতুন এবং ছবির মতো সুন্দর। সামনের দিকে নিচু গেট,

গেটের পর ছোট্ট একটু বাগান, বাগানের পর বাড়িটা।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে কলিং বেল টিপল সন্দীপ। ইউনিভার্সিটি থেকে এত দূরে এই সল্ট লেক পর্যন্ত সে যে ছুটে এসেছে, সেটা যেন সজ্ঞানে না, আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে। কলিং বেল টেপার পর হঠাৎ তার খেয়াল হল. এ সে কি করে বসেছে! এভাবে তুপুরবেলা অচেনা কারো বাড়িতে আসা ঠিক হয়নি। অমরনাথ যা বলেছিলেন অর্থাৎ আগে খবর দিয়ে তাঁর সঙ্গে এলেই ভাল হত। সে ফিরে যাবার জন্য যখন ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়াতে যাবে—সেই সময় দরজা খুলে গেল। এখন আর ফেরা যায় না। ফের ঘুরে দাঁড়াতেই দরজার ওধারে একজন মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখতে পেল। তিনি বললেন, 'কাকে চাই?'

মহিলার গলার স্বরটি ভারি মিষ্টি এবং বহুকালের চেনা যেন। সন্দীপ পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। অদৃশ্য সিনেমা স্লাইডে কুড়ি একুশ বছরের আশ্চর্য সুন্দর যে মেয়েটিকে সে কত কাল ধরে দেখে আসছে, অবিকল সেই চেহারা। তফাতের মধ্যে বয়সটা তেইশ চব্বিশ বছর বেড়ে গেছে। সিঁথির তু'ধারে কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য রুপোর তার এখন। শরীরে বয়সের ভার পড়েছে। কপালে প্রকাণ্ড সিঁতুরের টিপ। হাতে শাঁখা ছাড়া গোছা গোছা সোনার চুড়ি, গলায় সরু হার, বুকের কাছে মা কালীর ছবি লাগানো লকেট ঝুলছে। হাজারটা ব্যাণ্ড একসঙ্গে বেজে উঠলে যেমন হয়, সন্দীপের বুকের ভিতর তাই ঘটে যেতে লাগল। এক সময় চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে, বলে উঠল, 'তুমি—'বলেই দ্রুত শুধরে নিল, 'মানে আপনি পরমা দাসগুপ্ত না?'

সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবকের মুখে নিজের নাম শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মহিলাটি। আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু—' বলে সন্দীপের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিলেন। ভাবলেন, একে আপনি-টাপনি করে না বললেও চলে। একটু বাদে

ফের তিনি শুরু করলেন, 'কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না। আগে কখনও দেখেছি বলেও মনে হচ্ছে না।'

'না, আমাকে আগে দেখেননি। কিন্তু আপনাকে আমি চিনি। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।'

এই দুপুরবেলায় পুরুষমানুষেরা বাড়ি থাকে না, যে যার অফিস-টফিস বা কাজের জায়গায় চলে যায়। বাড়িতে মেয়েরা ছাড়া আর কেউ থাকে না। রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার রাস্তাগুলো এখন ফাঁকা ফাঁকা, নির্জন। গাড়ি চলাচলও এই সময়টা ভীষণ কমে যায়। সুযোগ বুঝে নানা রকম বাজে লোক বদ-মতলব নিয়ে কলিং বেল টেপে। তারপর দরজা খুললেই ছোরা বা রিভলবার দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে ডাকাতি টাকাতি করে উধাও হয়ে যায়। এই সল্ট লেকেও এ রকম দু-চারটে মারাত্মক কেস ঘটে গেল। কিন্তু এই ছেলেটাকে তেমন মনে হচ্ছে না। ভারি সরল আর নিষ্পাপ মুখ তার। তবু মুখ দেখে সব সময় মানুষ চেনা যায় না। দ্বিধান্বিতভাবে মহিলা বললেন, 'একটু কষ্ট করে তুমি অন্য সময় এসো।'

মহিলার মনোভাবটা আন্দাজ করতে পারছিল সন্দীপ। খানিকটা মজাই পেল সে। বলল, 'আমি যাদবপুরে পড়ি। ওখানকার হস্টেলে থাকি। এখন রেগুলার ক্লাশ চলছে, পড়াশুনার দারুণ প্রেসার। আমার পক্ষে অত দূর থেকে আর আসা সম্ভব হবে না।' একটু থেমে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি আমাকে চেনেন না কিন্তু আমাকে জানেন এমন লোক আপনার চেনা।'

'কে ?'

'অমরনাথবাবু।'

'কোন্ অমরনাথ ?'

'অমরনাথ দাশগুপ্ত। ওল্ড বালিগঞ্জে ওঁদের বাড়ি।'

স্মৃতির ওপর থেকে মুহূর্তে একটা পর্দা যেন সরে গেল। চোখেমুখে বিদ্যুৎ চমকের মতো কী যেন খেলে যেতে লাগল মহিলার।

সন্দীপ বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে অমরনাথবাবুকে ফোন করে জেনে নিতে পারেন।'

মহিলা বললেন, 'নতুন এ-পাড়ায় এসেছি। আমাদের টেলিফোন এখনও আসে নি। তা ছাড়া অমরনাথবাবুর কাছ থেকে জানবারও দরকার নেই। তোমার কথা বিশ্বাস করছি। ভেতরে এসো।'

ভেতরে নিয়ে গিয়ে চমৎকার সাজানো একটা ড্রইং রুমে সন্দীপকে বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিলেন মহিলা। তারপর নিজেও তার মুখোমুখি বসলেন।

সন্দীপ বলল, 'আমি আপনার কাছে একটা ব্যাপার জানতে এসেছি। তার আগে দু-একটা কথা বলতে চাই।'

'বেশ, তোমার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

'আছে। তবে এখন দরকার নেই।'

মহিলা একটু হাসলেন, বুঝতে পেরেছেন, দুপুরবেলা চা করার অসুবিধার কথা ভেবেই সন্দীপ খেতে চাইছে না।

ভোলার মা নামে একটি মাঝবয়সী মেয়েমানুষকে ডেকে চা এবং বিস্কুট-টিস্কুট আনতে বলে দিলেন মহিলা। বোঝা গেল ভোলার মা এ বাড়ির রান্নার লোক। সে চলে গেলে আবার সন্দীপের দিকে ফিরলেন, 'এবার শুরু কর—'

সন্দীপ একদৃষ্টে মহিলার দিকে তাকিয়েই ছিল। বলল, 'আপনার নাম তো জানি।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্বামীর নাম?'

'অমলেশ সেন।'

'চাকরি করেন?'

'হ্যাঁ। একটা ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির ওয়ার্কস ম্যানেজার।'

'ছেলেমেয়ে?'

মহিলা অর্থাৎ পরমা হেসে ফেললেন, 'এ সব জেনে কী করবে?'

একটু লজ্জা পেল সন্দীপ। মুখ নামিয়ে বলল, 'এমনি, জানতে ইচ্ছে হল।'

'আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে তোমারই বয়সী হবে। মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে; মেয়ে পড়ে স্কটিশে। এবার বি. এ. ফাইন্যাল দেবে। আর কী জানতে চাও?'

'এবার যা জানতে এত দূরে সল্ট লেকে এসেছি তাই জিজ্ঞেস করব।'

পরমা কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় কাজের সেই মেয়েমানুষটি ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম, বিস্কুট আর কাজু বাদাম নিয়ে এল। তাকে চলে যেতে বলে নিজের হাতে চা তৈরি করে সন্দীপকে দিলেন তিনি। নিজেও এক কাপ নিলেন। আলতো করে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'শুরু কর—'

'অমলেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে আর কারো সঙ্গে কি আপনার বিয়ের কথা হয়েছিল?'

পরমা চমকে উঠলেন। তাঁর কাপ থেকে চা চল্‌কে নিচের কার্পেটে পড়ে গেল। কাঁপা গলায় তিনি বললেন, 'আমাদের দেশে কুমারী মেয়েদের তো কত জায়গাতেই বিয়ের কথা হয়। কথা হতে হতে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় বিয়েটা হয়ে যায়। কিন্তু এ প্রশ্ন করছ কেন?'

পরমার শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পেল না সন্দীপ। ঘোরের মধ্যে থেকেই যেন বলে উঠল, 'আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। অনেক জায়গা থেকেই মেয়েদের বিয়ের সম্বন্ধ আসে। কিন্তু আমি একটা পার্টিকুলার ছেলের কথা বলছি। সে অমরনাথবাবুর ছেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত আর আপনি, একজন আরেক জনকে পছন্দ করতেন, ভালবাসতেন। আপনাদের মা-বাবারা তা জানতেন। তাঁরাই ঠিক করেছিলেন দু'জনের বিয়ে দেবেন। মনে পড়ছে?'

বুকের গভীরে কোন গোপন কুলুঙ্গি থেকে বহুকালের পুরনো আবেগ দুঃখ এবং বেদনা লাফ দিয়ে উঠে এসে পরমার মুখের ওপর ঢেউয়ের মতো বয়ে যেতে লাগল। দু'হাতে মুখ ঢেকে আবছা গলায় তিনি

বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু বিয়ে হবার আগেই তো সে চলে গেল।'

পরমার আবেগ এবং দুঃখ সন্দীপের মধ্যেও যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল। অবরুদ্ধ গলায় সে বলল, 'আপনার কি মনে আছে, জয়ন্তর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পর সে আপনাকে একদিন ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' মুখ থেকে হাত না সরিয়ে মাথা নাড়লেন পরমা।

সন্দীপ সামনের দিকে ঝুঁকল। বলল, 'গঙ্গার ধারে পাশাপাশি বসে জয়ন্ত আপনার হাতে একটা আংটি পরিয়ে দিয়েছিল। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, একটা হীরের আংটি।' বলেই দারুণ চমকে উঠলেন পরমা। মুখ থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে বললেন, 'কিন্তু তুমি এ সব জানলে কী করে? আংটির ব্যাপারটা জয়ন্ত আর আমি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে তো জানা সম্ভব না।'

সন্দীপ বলল, 'আমার মনে হয়েছিল ওটা জয়ন্ত আপনাকে দিয়েছে। তাই খবর নিতে আপনার কাছে চলে এসেছিলাম।' একটু থেমে ফের বলল, 'ওটা কি আপনার কাছে এখনও আছে?'

'আছে। সে তো কবেই চলে গেছে। শুধু তার সামান্য এই স্মৃতি-চিহ্নটা আমার কাছে রেখে দিয়েছি।' বলতে বলতে পরমার গলা বুজে আসতে লাগল। তাঁর চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

সন্দীপ আর কিছু বলল না। চা খেতে আর ভাল লাগছিল না তার। কাপটা সেণ্টার টেবলের ওপর নামিয়ে রেখে একদৃষ্টে পলকহীন পরমার দিকে তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত এক কষ্ট তার বুকের গভীরে যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাঁদলেন পরমা। তারপর হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হল, এভাবে একটি অচেনা যুবকের সামনে নিজের গোপন দুঃখ এবং দুর্বলতা প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। শাড়ির আঁচল দিয়ে দ্রুত চোখ মুছে ভাঙা আধবোজা গলায় তিনি বললেন, 'এই আংটির কথা তুমি

জানলে কি করে ?'

সন্দীপ বলতে যাচ্ছিল, 'আমি তোমার সব কথাই জানি। সেই ছেলেবেলা থেকে অদৃশ্য সিনেমা স্লাইডে কতবার যে তোমার ছবি দেখেছি তার ঠিক নেই।' কিন্তু এই কথাগুলো শেষ পর্যন্ত আর বলতে পারল না। সে শুধু বলল, 'কেন জানি আমার মনে হয়েছিল জয়ন্তর হীরের আংটিটা আপনার কাছেই আছে। সেটা জানবার জন্যেই এখানে এসেছিলাম। আমি এবার যাব।'

কী ভেবে পরমা বললেন, 'আরেকটু বসো।'

'কিছু বলবেন ?'

'হ্যাঁ—' পরমা বললেন, 'তুমি কে আমি জানি না। ঝোঁকের বশে আমার জীবনের খুব গোপন কথা বলে ভুল করলাম কিনা তাও বলতে পারব না।'

পরমার কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। ব্যস্তভাবে সন্দীপ বলে উঠল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাকে দিয়ে আপনার ক্ষতি হবে না।'

একদৃষ্টে খানিকক্ষণ সন্দীপের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরমা। তারপর বললেন, 'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।'

একটু চুপ। একসময় পরমাই আবার বললেন, 'আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সামাজিক মানমর্যাদা, পারিবারিক শান্তি—এ সবের প্রশ্ন তো আছেই। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। আমার জীবনের সেই গোপন দিকটার কথা যদি জানাজানি হয়ে যায়, আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।'

'কোন ভাবেই জানাজানি হবে না। আমার দিক থেকে আপনার ভয় নেই।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সন্দীপ।

পরমাও উঠে পড়লেন। বললেন, 'এখনই যাবে ?'

'হ্যাঁ। অনেকক্ষণ এসেছি।'

পরমা বাইরের গেট পর্যন্ত সন্দীপের সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গেটের

ওপারে গিয়ে ফের সন্দীপ বলল, 'চিন্তা করবেন না। কথা দিচ্ছি, আপনার কোন রকম ক্ষতি আমি করব না।' বলে রাস্তায় গিয়ে নামল। অনেকটা এগিয়ে যাবার পর ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল, গেটের কাছে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন পরমা।

ঘন্টাদেড়েক বাদে ওল্ড বালিগঞ্জে সেই মোটা মোটা থামওলা গথিক স্ট্রাকচারের বাড়িটায় চলে এলো সন্দীপ। তুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল হতে চলেছে। রোদের রঙ এখন ঘন হলুদ।

অমরনাথ লনে গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বসে ছিলেন। ওধারের বাগানে মালীরা কাজ করছে। সারা তুপুর ঘুমোন না অমরনাথ। লনে বসে বসে মালীদের কাজের তদারক করেন। রিটায়ার করার পর ফুলের ঐ বাগানটা তাঁর সারাদিনের অর্ধেকটাই দখল করে আছে।

সন্দীপকে দেখে গলার স্বর উঁচুতে তুলে ডাকতে লাগলেন, 'এখানে এসো—'

সন্দীপ নুড়ির রাস্তা থেকে লনে নেমে অমরনাথের কাছে চলে এল। অমরনাথ তাকে বসতে বললেন। মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ল সন্দীপ।

তার মুখে-চোখে উত্তেজনা এবং ক্লান্তির ছাপ রয়েছে। তুপুরবেলা সল্ট লেকে গিয়ে আবার একটু পরই ফিরে আসার জন্য ক্লান্তি, পরমার কাছ থেকে হীরের আংটি সম্পর্কে বহুকাল আগের একটা পুরনো গোপন খবর জানার জন্য উত্তেজনা। হয়তো বা পরমার জন্য খানিকটা তুঃখও তার মুখে ফুটে থাকবে।

অমরনাথ সন্দীপকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, 'তোমাকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে।'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ, একটু টায়ার্ড লাগছে। সেই হীরের আংটিটার খোঁজে সল্ট লেকে পরমাদেবীদের বাড়ি ঘুরে এলাম তো।'

অমরনাথ সোজা হয়ে বসলেন, 'খোঁজ পেলে!'

'পেয়েছি। আপনার ছেলে জয়ন্ত সেটা ওঁকে দিয়েছিল। আংটিটা পরমাদেবীর কাছেই আজো আছে।'

অমরনাথ অবাক বিস্ময়ে শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করতে পারলেন, 'আছে!'

'হ্যাঁ। ইচ্ছা করলে নিজে গিয়ে পরমাদেবীর কাছ থেকে জেনে আসতে পারেন। কিন্তু আর কেউ যেন জানতে না পারে। এতদিন পর জয়ন্তর সঙ্গে পরমাদেবীর পুরনো সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে ওঁদের পারিবারিক শান্তি নষ্ট হবে। এই খবরটা দেবার জন্যেই এসে-ছিলাম। এবার আমি যাই।'

'তাই হয় নাকি? তোমার মাসিমার সঙ্গে দেখা না করে গেলে উনি দুঃখ পাবেন। তা ছাড়া সোনারও আজ কলেজ নেই। ও বাড়িতেই আছে।'

অগত্যা কি আর করা, সন্দীপকে লন পেরিয়ে বাড়ির ভেতরেই যেতে হল। তার পরও মিনিট কয়েক গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বসে রইলেন অমরনাথ। হঠাৎ বিধুশেখরের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। তক্ষুনি উঠে পড়লেন। ড্রাইভারকে ডেকে গাড়ি বার করিয়ে বললেন, 'বিধুবাবুর বাড়ি চল।'

বিধুশেখরকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। দুপুরবেলা তাঁর ঘুমানোর অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে চা খাচ্ছিলেন। বন্ধুকে দেখে তাঁর জন্য চা-টা আনতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ বিনা নোটিশে আবির্ভাব?'

অমরনাথ বললেন, 'তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। যেভাবে ছুটতে ছুটতে আসছ, নিশ্চয়ই খুব জরুরি ব্যাপার।'

'হ্যাঁ।' বলে হীরের আংটিটা সম্বন্ধে সন্দীপ যা যা বলেছে বিধু-শেখরকে জানালেন অমরনাথ। তারপর বললেন, 'তোমার কি মনে হয় সন্দীপ ঠিক কথা বলছে?'

বিধুশেখর বললেন, 'ডেফিনিট্‌লি। মিথ্যে বলে তার কি লাভ?'

'তুমি বলছ, হীরের আংটিটা জয়ন্ত পরমাকেই দিয়েছিল?'

'নিঃসন্দেহে। সে তা স্বীকারও করেছে। খোঁজ নিলেই জানতে পারবে।'

'আমার মাথাটা একেবারেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বিধু। সন্দীপ কি করে এত খবর জানতে পারছে, কিছুতেই বুঝতে পারছি না। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ঝানু গোয়েন্দাদের দু'বছর লাগিয়ে রাখলেও এত খবর বের করা সম্ভব নয়। সন্দীপ তো একটা বাচ্চা ছেলে।'

বিধুশেখর বললেন, 'তোমাকে সেদিন একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা বল তো?'

'জাতিস্মর।'

অমরনাথের মনে পড়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলেছিলে বটে।'

বিধুশেখর বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে এবার বললেন, 'আমার স্থির বিশ্বাস সন্দীপ তোমার গত জন্মের ছেলে। মানে ও হল জয়ন্ত।'

'তুমি বলতে চাও জয়ন্ত মৃত্যুর পর এ জন্মে সন্দীপ হয়ে জন্মেছে?'

বিধুশেখর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'অবশ্যই।'

অমরনাথের সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু একটা বয়ে যেতে লাগল। তাঁর যুক্তিবাদী মন বিধুশেখরের কথায় সায় দিতে চায় না, কিন্তু সন্দীপ যা যা বলেছে এবং করেছে সে সব ভাবলে অস্বীকারও করা যায় না। বিমূঢ়ের মতো অমরনাথ বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার।'

'আশ্চর্যের কিছু নেই। তুমি তো জানোই, আমি ওকাল্টিজ্‌মের চর্চা করি। জাতিস্মরদের সম্বন্ধে অজস্র লেখা দেশ বিদেশের কাগজে পড়েছি। অনেকে পূর্বজন্মের কোন কিছুই ভোলে না। নতুন জন্ম নিলেও আগের সব কিছু পরিষ্কার মনে করতে পারে। ভেবে দেখ,

সন্দীপ যদি জয়ন্ত না হত, এত সব ডিটেলে বলতে পারত না।

অমরনাথ এবার কিছু বললেন না। পঁচিশ বছর আগে যে ছেলেকে তিনি হারিয়েছেন অন্য চেহারায়, অন্য নামে, অন্যের সন্তান হয়ে এই পৃথিবীতে আবার সে ফিরে এসেছে। সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য কে জানে, তার দেখাও পেয়েছেন অমরনাথ। সন্দীপ যদি গ্রীনল্যাণ্ডে বা ল্যাটিন আমেরিকায় জন্মাত কিংবা বিকাশের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব না হত, কোন দিনই তার কথা জানা যেত না। নতুন করে জন্ম নিয়েও বিশাল পৃথিবীর তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে তাঁর সন্তান হারিয়েই যেত। সন্দীপের জন্য হঠাৎ আবেগ এবং আকুলতায় অমরনাথের বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। জয়ন্ত ভোলেনি, কিছুই ভোলেনি। গত জন্মের টানে তাঁদের কাছে চলে এসেছে।

বিধুশেখর আবার বললেন, 'এখন কি করবে, ভাবছ ?'

অমরনাথ আচ্ছন্নের মতো বসে ছিলেন। চমকে উঠে বললেন, 'কি করা যায় বল তো। মমতার কথা তো জানো। ছেলেকে হারাবার পর থেকে কি রকম হয়ে গেছে। ও যদি সন্দীপের ব্যাপারটা জানতে পারে কিছুতেই ওকে ছাড়বে না।'

'ঠিকই বলেছ। জয়ন্ত মারা গেছে ; আস্তে আস্তে প্রকৃতির নিয়মেই সেই শোকটা অনেক কমে এসেছে। এখন সন্দীপের এই ব্যাপারটা নতুন করে একটা প্রবলেম তৈরি করল দেখছি।'

বিধুশেখর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'এক কাজ কর অমর— আপাতত তোমার স্ত্রীকে সন্দীপের আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দরকার নেই। এর মধ্যে তুমি একবার বেনারস ঘুরে এসো।'

'বেনারসে কেন ?'

'সন্দীপের মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে ছেলের ব্যাপারটা বল। সন্দীপ যাতে মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে এসে থাকে তার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে নাও। হাজার হোক, ওঁরা জয়ন্তর এ জন্মের মা-বাবা ; তোমরা গত জন্মের। এ জন্মের মা-বাপের ক্লেমই তো বেশি। ওদের কনসেন্ট

নিতেই হবে।'

অমরনাথ বললেন, 'বেশি কি বলছ! পুরোপুরি ষোল আনা।' একটু থেমে ফের বললেন, 'তুমি খুব ভাল সাজেসান দিয়েছ। দু-এক-দিনের মধ্যেই আমি বেনারস যাব। জয়ন্ত এ জন্মে কার ঘরে জন্মেছে একটু দেখে আসি। আর তুমি যদি বল, একটা কাজ করি—'

'কি?'

'মমতাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। বেচারা অনেক দিন বাইরে-টাইরে বেরোয় নি।'

'ঠিক আছে, নিয়েই যাও। ওরই তো ছেলে। তবে বেনারসে পৌঁছবার আগে সন্দীপের কথা বলো না। তাহলে কেঁদে কেটে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে বসবে।'

'না না, তা বলব না।'

'দেবা-দেবী দু'জনেই চলে গেলে তোমার বাড়ি দেখবে কে?'

'আমার দূর সম্পর্কের শালীর মেয়ে সোনাকে তো সেদিন দেখেছ। ও থাকবে। ওর দাদা বিকাশ হস্টেলে থাকে। আমরা যে ক' দিন না ফিরছি, বিকাশকে আমাদের ওখানে এসে থাকতে বলব। দুই ভাইবোন বাড়ি পাহারা দেবে।'

'তাহলে বাবা বিশ্বনাথের নাম করে কাশীর টিকেট কেটে ফেল। বিশ্বনাথের কৃপায় জয়ন্তর এ জন্মের মা-বাপ আর গত জন্মের মা-বাপের মিলন শুভ হোক।'

'তোমার মুখে ঘিউ-শক্কর পড়ুক।' ঘিউ-শক্কর অর্থাৎ ঘি এবং মিষ্টি। এটা ইউ-পি'র প্রবাদ। কাউকে আনন্দ দিতে হলে মুখে ঘি এবং মিষ্টি পড়ার কথা বলতে হয়।

বিধুশেখর বললেন. 'ছেলে ফিরে পেতে যাচ্ছ। মুখে মুখে ঘি-মিষ্টির কথা বললে চলবে না; সত্যি সত্যি খাওয়াতে হবে।'

অমরনাথ হাসলেন, 'তোমার রেশন তো মাছ সেদ্ধ, মাংসের স্যুপ আর গলা ভাত।'

'তোমার ছেলের ব্যাপারটা যেদিন সুরাহা হবে সেদিন মোরগ মুসল্লম খাব।'

'তথাস্তু।'

বিধুশেখরের বাড়ি থেকে ঘোরের মধ্যে অমরনাথ যখন ওল্ড বালিগঞ্জে ফিরে এলেন তখন সন্ধে। সন্দীপ তখনও হস্টেলে ফিরে যায়নি। নিচে ড্রইং রুমে বসে মমতা আর সোনালীর সঙ্গে গল্প করছে। অমরনাথ তার পাশে গিয়ে বসলেন। এবং একদৃষ্টে তাকে দেখতে লাগলেন।

মমতা স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? মালীদের কাছে খোঁজ নিয়ে এসে যুধিষ্ঠির বলল, তুমি নাকি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, এই বিধুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে এলাম। অনেকদিন যাওয়া হয়নি।'

'কেমন আছেন তোমার বন্ধু?'

'ভাল।'

মমতার সব কথারই উত্তর দিচ্ছেন অমরনাথ। তবে দূরমনস্কর মতো। আসলে তাঁর চোখ সন্দীপের ওপর স্থির হয়ে আছে। ইচ্ছা হচ্ছিল, খুব ছোটবেলায় জয়ন্তকে যেভাবে বুকের ভেতর টেনে নিতেন ঠিক সেইভাবে সন্দীপকে টেনে এনে আদর করেন। ছেলেটাকে দেখতে দেখতে তাঁর বুকের ভেতরটা উথাল-পাথল হয়ে যাচ্ছে। একবার সন্দীপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও তিনি থেমে গেলেন। হঠাৎ এভাবে আদর-টাদর করলে সবাই হকচকিয়ে যাবে।

সন্দীপের মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে অমরনাথ স্ত্রীকে বললেন, 'মমতা, তুমি আর আমি দিন কয়েকের জন্য একটু বেড়াতে যাব।'

মমতা অবাক। বললেন, 'কোথায়?'

'এই দিল্লী লক্ষ্ণৌ এলাহাবাদ বেনারস—আপার ইণ্ডিয়ার যেখানে

যেখানে যাওয়া যায়।' বেনারসটাই যে আসল এবং একমাত্র গন্তব্য-স্থান সেটা বুঝতে দিতে চান না অমরনাথ। তাই ওটার সঙ্গে দিল্লী-টিল্লী জুড়ে দিয়েছেন।

'হঠাৎ বেড়াবার শখ হল ?'

'অনেক দিন বেরুনো হয়নি, তাই।'

'কিন্তু সোনার তো এখন ক্লাশ চলছে। ওকে একা এত বড় বাড়িতে ফেলে এখন বেরুনো যায় নাকি ?'

'তার ব্যবস্থাও করেছি।' বলে কী ব্যবস্থা করেছেন, স্ত্রীকে জানিয়ে দিলেন অমরনাথ।

তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন মমতা, 'আমরা ট্যাং ট্যাং করে বেড়াতে যাব আর ছেলেমেয়ে দুটো এখানে পড়ে থাকবে। অসুবিধা-টসুবিধা হবে—'

সোনালী ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'কোন রকম অসুবিধা হবে না। আমরা ঠিক থাকতে পারব। মেসো আর তুমি ঘুরে এস।'

অমরনাথ সোনালীর দিকে ফিরে বললেন, 'দ্যাট্স লাইক এ গুড গার্ল। কী কনসিডারেট। এই জন্যেই তো সোনাটাকে আমার এত ভাল লাগে।' বলেই আবার সন্দীপের দিকে তাকালেন, 'আরে ভাল কথা, তোমাদের বেনারসের ঠিকানাটা বল তো। ওখানে গেলে একবার তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করে আসব।' হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়েছে, এভাবে বললেন অমরনাথ। আসলে এই বেড়াতে বেরুবার একমাত্র উদ্দেশ্যই যে সন্দীপের বাড়ি যাওয়া, সেটা তিনি কোন ভাবেই বুঝতে দিতে চান না।

সন্দীপ বেনারসের বেনিয়াবাগে তাদের রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বরটা জানিয়ে দিল। অমরনাথ সোনালীকে ঠিকানাটা টুকে নিতে বলে সন্দীপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাবার নাম কী ?'

সন্দীপ বলল, 'সুরেশ্বর দত্ত।'

'উনি কি সার্ভিসে আছেন ?'

'না। বেনারসে আমাদের বেনারসী শাড়ির বিজনেস আছে। দোকান-টোকান নয়। নাম-করা কারিগরদের দিয়ে শাড়ি বানিয়ে বাবা ফরেন সাপ্লাই করেন। ফরেনে বেনারসী শাড়ির ভীষণ ডিমাণ্ড।'

'হ্যাঁ।'

এরপর আর কোন কথা হল না।

দিন তিনেকের আগে ট্রেনে রিজার্ভেসন পাওয়া গেল না। এখন বেনারস এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ টক্ষ্ণৌর দিকে প্রচণ্ড 'রাশ'। এমনিতে কুড়ি বাইশ দিন আগে রিজার্ভেসন পাবার কথা নয়; নেহাত জানাশোনা থাকায় তিন দিন পর ব্যবস্থা হল।

অমরনাথরা প্রথমে নামবেন বেনারসে। সেখানে দিন কয়েক কাটিয়ে এলাহাবাদ। তারপর সুবিধা মতো দিল্লী টিল্লী। আসলে এই রকমই জানিয়েছেন অমরনাথ। কিন্তু তাঁর মাথায় অন্য পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ বেনারস ছাড়া আপাতত আর কোথাও যাবেন না। সে প্রয়োজনও নেই। সন্দীপের মা-বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই কলকাতায় ফিরে আসবেন।

আজ রাত্তিরে বেনারসের ট্রেন। সোনালী বিকাশ এবং সন্দীপ হাওড়া স্টেশনে অমরনাথ আর মমতাকে তুলে দিতে এসেছিল। অবশ্য সন্দীপের আসার ঠিক ইচ্ছা ছিল না, অমরনাথরা বার বার বলায় আসতে হয়েছে।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা কুড়িতে ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মমতা এবং অমরনাথ তিন জনের উদ্দেশেই বললেন, তারা যেন সাবধানে থাকে। কোন রকম অনিয়ম-টনিয়ম না করে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিকাশরা জানালো, অমরনাথরা যেমনটি বলেছেন ঠিক সেভাবেই চলবে।

জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে অমরনাথরা নাড়তে লাগলেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সন্দীপরাও হাত নাড়তে লাগল।

একসময় ট্রেনটা স্টেশন ছাড়িয়ে ডিসটান্ট সিগনাল পেছনে ফেলে অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সন্দীপরা হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে প্রাইভেট কারের পার্কিং এরীয়ায় চলে এল। অমরনাথের ফোর্ড গাড়িটা করে ওরা হাওড়ায় এসেছিল। গাড়িটা ওখানেই রয়েছে।

ড্রাইভার স্টিয়ারিং-এর কাছে বসে ছিল। সন্দীপরা উঠে বসতেই স্টার্ট দিল।

একটু পরেই পার্কিং এরীয়া থেকে বেরিয়ে নতুন সাবওয়ের পাশ দিয়ে গাড়িটা হাওড়া ব্রিজে চলে এল। ব্রিজ পেছনে রেখে কয়েক মিনিটের মধ্যে বড় বাজারের ফ্লাইওভার। সেখান থেকে ব্যাবোর্ন রোড হয়ে ডালহৌসির ভেতর দিয়ে সোজা রেড রোড।

রাস্তায় আজ বিশেষ জ্যাম ট্যাম নেই। গাড়িটা প্রায় উড়েই চলেছে যেন।

আগে থেকেই ঠিক করা আছে, সন্দীপকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে বিকাশ এবং সোনালী ওল্ড বালিগঞ্জে ফিরে যাবে।

ব্যাক সীটে ডানদিকের জানালার ধার ঘেঁসে বসে আছে সন্দীপ ; বাঁ দিকের জানালার পাশে সোনালী, মাঝখানে বিকাশ।

সোনালী এবং বিকাশ সমানে কথা বলে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে না ; এলোমেলো নানা ধরনের গল্প। মাঝে মাঝে সন্দীপকে দেখেও দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করছিল। সন্দীপের চোখ জানালার বাইরে ফেরানো। অন্যমনস্কর মতো সে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছিল। আসলে রাস্তার দু'ধারের উজ্জ্বল আলো, গাড়ির স্রোত, মানুষজন, অন্যান্য দৃশ্য বা বিকাশের কথাবার্তা— কোন দিকেই লক্ষ্য নেই সন্দীপের।

বাইরের দৃশ্য টৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ অদৃশ্য সিনেমা স্লাইডে

অনেক দিন আগের একটা ফটো অ্যালবাম ভেসে উঠল। এই অ্যালবামটার কথা বহু বার তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন অমরনাথ। ওটাতে অমরনাথের সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুদের ফটো রয়েছে। কিন্তু অ্যালবামটা ওল্ড বালিগঞ্জের সুবিশাল বাড়ির কোথায় রয়েছে কিছুতেই মনে করতে পারে নি সন্দীপ। কিন্তু রেড রোড দিয়ে যেতে যেতে এই মুহূর্তে আচমকা সেটার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত জানালার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে দারুণ উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'বিকাশ, এখন আমি হস্টেলে ফিরব না।'

সন্দীপের আকস্মিক উত্তেজনা বিকাশ এবং সোনালীকে অবাক করে দিল। বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবি তা হলে?'

'তোদের সঙ্গে ওল্ড বালিগঞ্জে।'

বিকাশ এবং সোনালী দারুণ খুশি। বিকাশ বলল, 'গ্র্যাণ্ড। রাতটা ওখানে থেকে যা। তিনজনে চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে।'

সোনালী বলল, 'কাল কখন তোমাদের ক্লাশ দাদা?'

বিকাশ জানালো, কাল তার প্রথম ক্লাশ বারোটায়। সন্দীপেরও তা-ই।

সোনালী বলল, 'ভালই হয়েছে। কাল আমার ছুটি। তোমরা একসঙ্গে খেয়ে দেয়ে ইউনিভার্সিটিতে চলে যেও।'

সন্দীপ বলল, 'আমি কিন্তু রাত্তিরে থাকার জন্যে যাচ্ছি না। অন্য দরকার আছে।'

'কী?' সোনালী এবং বিকাশ একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'ও বাড়িতে গিয়ে একটা জিনিস খুঁজব। সেটা পেয়ে গেলেই হস্টেলে ফিরে যাব। কাইণ্ডলি তোদের ড্রাইভারকে বলে দিস, আমাকে যেন হস্টেলে দিয়ে আসে।'

বিকাশ খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'তা না হয় দিয়ে আসবে। কিন্তু এত রাতে মেসোর বাড়ি গিয়ে কী খুঁজবি?'

'একটা অ্যালবাম।'

'কিসের অ্যালবাম ?'

'মনে নেই তোর মেসো সেদিন কী বলেছিলেন ?'

বিকাশ মনে করতে পারল না। বলল, 'না, ঠিক—'

সন্দীপ বুঝিয়ে দিল, অমরনাথের শত্রুদের ফটোতে বোঝাই যে অ্যালবামটা তিনি জয়ন্তকে রাখতে দিয়েছিলেন, সেটাই এখন খুঁজতে যাচ্ছে সে।

বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালবামটা পাওয়া যাবে ?'

'যেতে পারে।'

ওল্ড বালিগঞ্জে পৌঁছে ড্রইং রুমে আর বসল না সন্দীপ। বিকাশদেরও বসতে দিল না। প্রচণ্ড তাড়া লাগিয়ে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলল, 'চল, ওপরে যাই—' বলতে বলতে একতলার ড্রইং রুমের ভেতরকার সিঁড়ি টপকে টপকে দোতলায় উঠে গেল। বিকাশ এবং সোনালীও তার পেছন পেছনে ছুটল। অ্যালবামটার ব্যাপারে তাদের ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছে।

দোতলায় উঠে সোজা জয়ন্তর ঘরে ঢুকে পড়ল সন্দীপ। তীক্ষ্ণ চোখে খাট আলমারি টেবল সোফা রেডিওগ্রাম রেকর্ড স্ট্যাণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদি লক্ষ্য করতে লাগল। খানিকটা আগে রেড রোড দিয়ে আসতে আসতে অদৃশ্য স্ক্রীনে একটা ওয়ার্ডরোবের ছবি ফুটে উঠেছিল। কোন এক সময়, সেটা যে কবে, ওয়ার্ডরোবটা এ ঘরেই ছিল। এখন সেটা দেখা যাচ্ছে না।

সন্দীপ ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে বিকাশদের দিকে তাকাল সে। জিজ্ঞেস করল, 'এ ঘরে কি আগে একটা ওয়ার্ডরোব ছিল ?'

বিকাশ এবং সোনালী একই সঙ্গে বলে উঠল, 'তা বলতে পারব না। আমরা তো এই সেদিন এ বাড়িতে এলাম। মাসি মেসো থাকলে বলতে পারত। কিন্তু তারা তো এখন ট্রেনে—'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সন্দীপ বলল, 'ওয়ার্ডরোবের ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে।'

বিকাশরা কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

সন্দীপ এবার বলল, 'তোর মাসি মেসোকে এখন পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলে আর কার পক্ষে বলা সম্ভব?'

বিকাশ বলল, 'আর কে বলবে! কাজের লোক, রান্নার লোক, ড্রাইভার, মালী ছাড়া আর তো কেউ নেই। তারা কি ওয়ার্ডরোবের কথা বলতে পারবে? কতদিন আগের ব্যাপার।'

সন্দীপ উত্তর দিল না। চোখ কুঁচকে একটু চিন্তা করতেই হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল সন্দীপের। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে এবার সে বলল, 'আরে যুধিষ্ঠিরদা তো এ বাড়িতে অনেকদিন কাজ করছে—'

'হ্যাঁ।'

'সে হয়তো বলতে পারে। তার কাছেই জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।' বলতে বলতে বাইরের বারান্দায় গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'যুধিষ্ঠিরদা—যুধিষ্ঠিরদা—'

'যাই—' তক্ষুনি নিচতলা থেকে সাড়া পাওয়া গেল। একটু বাদে যুধিষ্ঠির ওপরে উঠে এল। তাকে জয়ন্তর ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্দীপ বলল, 'আচ্ছা যুধিষ্ঠিরদা, এ ঘরে কোনদিন একটা ওয়ার্ডরোব ছিল?'

এক সেকেণ্ডও না ভেবে যুধিষ্ঠির বলল, 'জামাকাপড় রাখার বেঁটে আলমারি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'ছিল। কিন্তুন সে তো অনেক দিনের কথা।'

উত্তেজনায় যুধিষ্ঠিরের হাত জড়িয়ে ধরল সন্দীপ। বলল, 'কতদিন আগের?'

যুধিষ্ঠির বলল, 'তখন জয়দাদা বেঁচে ছিল। সে সগ্‌গে যাবার পরও কয়েক বছর জিনিসটা এঘরে দেখেছি। তারপর—'

মারাত্মক উত্তেজনায় যুধিষ্ঠিরের দু কাঁধ আঁকড়ে ধরল সন্দীপ। বলল,

'তারপর কী ?'

'ঘুণ ধরে গিয়েছিল বলে বড়বাবু ওটাকে এ ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

প্রায় চিৎকার করে উঠল সন্দীপ, 'কোথায়, কোথায় বার করে রাখলেন তোমার বড়বাবু ? ওটা কি আর পাওয়া যাবে না ?'

সন্দীপের নখ কাঁধের মাংসে গেঁথে গিয়েছিল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে যুধিষ্ঠির বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, একটুন ভেবে নিই।'

সন্দীপ যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল।

চোখ এবং ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ কী ভাবল যুধিষ্ঠির। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নিচে গুদোম মতো একটা ঘর আছে। বড়বাবু ওটাকে সেখানে নামিয়ে দিয়েছিল।'

তুর্দান্ত আগ্রহের গলায় সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ার্ডরোবটা এখনও আছে ?'

যুধিষ্ঠির দার্শনিকের মতো মুখ করে বলল, 'উই-টুই পোকামাকড়ে যদি সাবাড় না করে থাকে, তা হলে আছে।'

সন্দীপ বলল, 'আমাকে নিচের সেই ঘরে নিয়ে চল যুধিষ্ঠিরদা—'

যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে বলল, 'ওখানে গিয়ে কী করবে দাদাবাবু! রাজ্যের বাতিল ভাঙাচোরা জিনিস ডাঁই হয়ে আছে। ধুলোবালি ছুঁচো ইঁদুর আর আরশোলা চামচিকের আস্তানা। কত কাল ও ঘর খোলা হয় না।'

'না হোক, তুমি আমাকে নিয়ে চল—' যুধিষ্ঠিরকে টানতে টানতে নিচে নামিয়ে আনল সন্দীপ। সোনালী আর বিকাশও তাদের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় চলে এল।

যুধিষ্ঠির শেষবার বোঝাতে চাইল, ঐ বদ্ধ ঘরে নোংরা ময়লা ঘাঁটলে অসুখ বিসুখ করতে পারে, চেলা বিছেটিছে থাকলে কামড়ে দিতে পারে।

কিন্তু কোন কথাই শুনল না সন্দীপ। অগত্যা যুধিষ্ঠির এক তলার

এক কোণে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা ঘরের তালা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দিল।

দরজা খুলতেই বহুকালের আবদ্ধ ভ্যাপসা বাতাস ভক করে বেরিয়ে এল। বোঝা গেল, দীর্ঘকাল মনুষ্যজাতির কেউ এ ঘরে ঢোকে নি। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছিল। ভাঙা খারিজ আসবাবপত্র, হাঁড়িকুড়ি, তুলো বার হওয়া লেপ-তোষক, ছোবড়া-বেরুনো জাজিম, ধুলোবালি এবং আরো নানা ধরনের আবর্জনায় ঘরটা বোঝাই। এখানকার বিষাক্ত বাতাসে দুর্গন্ধ। তারই মধ্যে এক কোণে দাঁড় করানো ঘুণে-খাওয়া পুরনো ওয়ার্ডরোবের পাল্লা খুলে ভেতর দিকের গোপন ড্রয়ার থেকে একটা অ্যালবাম বার করে আনল সন্দীপ।

বিকাশ সোনালী আর যুধিষ্ঠিরের চোখে পলক পড়ছে না। তারা যেন অবিশ্বাস্য ম্যাজিক দেখছে।

ভাগ্যই বলতে হবে, ওয়ার্ডরোবটার আধাআধি উইয়ের পাকস্থলীতে চলে গেলেও অ্যালবামটা প্রায় আস্তই আছে। শুধু ওপরের মোটা কভারটায় উইয়েরা সবে দাঁত বসাতে শুরু করেছে। অ্যালবামটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সন্দীপ হেসে বিকাশকে বলল, 'যাক, জিনিসটা তা হলে পাওয়া গেল।'

বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটে নি দুই ভাইবোনের। বিকাশ বলল, 'তাই তো দেখছি। এমন ভেলকি আগে আর কখনও দেখিনি ভাই। তুই জাদু জানিস।'

'তোর মেসোমশাই বেড়িয়ে ফিরে এলে এটা তাঁর হাতে তুলে দেওয়া যাবে।'

সোনালী বলল, 'এই সেই অ্যালবাম যাতে মেসোর ডেঞ্জারাস ডেঞ্জারাস সব শত্রুদের ফটো রয়েছে, তাই না সন্দীপদা?'

সন্দীপ বলল, 'হ্যাঁ, থাকা উচিত।'

'মহাপুরুষদের ফটোগুলো দেখি—'

'এই নোংরা গোডাউনে দাঁড়িয়ে না থেকে চল ড্রইং রুমে গিয়ে

দেখা যাক।'

সন্দীপ বিকাশ এবং সোনালী বসবার ঘরে এসে মুখোমুখি বসল। যুধিষ্ঠির পারিবারিক এই গুদাম ঘরটার দরজা বন্ধ করে তালা আটকাতে লাগল।

অ্যালবামের কভারটার পর দুটো পাতা ফাঁকা। অনেক দিনের পুরনো বলে পাতাগুলো হলদে হয়ে আছে।

সন্দীপই পাতা উল্টে যাচ্ছিল। বুকের ভেতর তার শ্বাস যেন আটকে আছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জয়ন্তর হত্যাকারীর ফটো পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। যদি পাওয়া যায়? অদ্ভুত অপার্থিব এক উত্তেজনায় তার হাত কাঁপতে লাগল।

সোনালী এবং বিকাশও রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে। এই সুবিশাল ড্রইং রুম জুড়ে এখন অলৌকিক এক স্তব্ধতা। ছুঁচ পড়লে শব্দ পাওয়া যাবে।

ঝাঁঝালো বোটকা গন্ধ উঠে আসছে অ্যালবামটা থেকে। দু পাতার পর এক জায়গায় ইংরেজিতে যা লেখা আছে, বাংলায় ট্রান্সলেট করলে এইরকম দাঁড়ায়—'আমার শত্রুদের ফটোর প্রদর্শনী'। চাকরি জীবনে যে ক'জন ভয়াবহ শত্রু আমি লাভ করেছি তাদের ছবি পর পর সাজিয়ে রাখা হল। আমার জন্য এদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। কাজেই এরা আর বন্ধু থাকে কী করে? এদের মধ্যে দু'জনকে ছাড়া বাকী সবাইকেই জেলে পুরতে পেরেছি। আমার দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের চাকরিতে মাত্র এই দুই অপরাধীকেই ধরতে পারিনি। পৃথিবী থেকে তারা যেন একেবারেই গায়েব হয়ে গেছে। সবাই আমাকে কৃতী পুলিশ অফিসার বলে থাকে। কিন্তু ষোল আনা সাফল্য লাভ আমার ঘটে নি; সামান্য একটু খুঁত সেখানে থেকে গেছে। আমার জীবনে এই দু'টিই মোটে ব্যর্থতা।

এই অপরাধীরা প্রত্যেকেই আমাকে শাসিয়েছে, বদলা নেবে। আট দশ বছর জেলের লাপসি খাবার পর বদলা নেবার ক্ষমতা কার কতটা

থাকে, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে। আমি কাউকেই কোনদিন গ্রাহ্য করি নি ; করবও না।'

লেখাটা পড়ে পড়ে সোনালী এবং বিকাশকে শোনালো সন্দীপ। তারপর বলল, 'তোর মেসোমশাই সেদিন বলেছিলেন, অ্যালবামের এই সব শত্রুর মধ্যেই কেউ তাঁর ছেলেকে খুন করে থাকবে।'

বিকাশ বলল, 'হতে পারে। তুই পাতা উল্টে যা। মহাপ্রভুদের চেহারাগুলো একবার দেখা যাক।'

সন্দীপ পাতা ওল্টাতে লাগল। প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটা করে ফটো। খুব দামী ক্যামেরায় তোলা বলে ফটোগুলো এতদিন বাদেও ভাল আছে। অবশ্য সাদা অংশগুলো হলদে হয়ে গেছে।

প্রতিটি ফটোর নিচেই ক্রিমিনাল ওয়ার্ল্ডের এই সব সুপারস্টারদের নাম ঠিকানা এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে এদের কেউ ভুয়ো ফার্ম খুলে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের লাইসেন্স বার করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে। কেউ প্রতিরক্ষা দপ্তরের গোপন দলিল বার করে বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে চড়া দামে পাচার করত। কেউ জালিয়াতি করে ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা সরিয়েছে। কেউ গোটা ইণ্ডিয়া জুড়ে আড়কাঠি লাগিয়ে নানা জায়গার গরীব ফ্যামিলি থেকে ফুসলে-ফাসলে বা চাকরির লোভ দেখিয়ে মেয়ে যোগাড় করত। তারপর পাঞ্জাবের মেয়ে চালান হয়ে যেত হায়দ্রাবাদে, বাঙলার মেয়ে দিল্লীতে, কেরলের মেয়ে কলকাতায়। কারো কাজ ছিল গভর্ণমেন্টের ইমপর্টাণ্ট সব ডকুমেণ্ট জাল করা। পৃথিবীতে কত রকমের ক্রাইম আর ক্রিমিনাল থাকতে পারে, এই অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে গেলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হয়ে যায়।

সন্দীপের মাথা ঘুরছিল। তবু দুর্বোধ্য আকর্ষণে পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিল সে।

বিকাশ এবং সোনালীও ঝুঁকে ছবিগুলো দেখছিল। বিকাশ বলল, 'মেসোর এই অ্যালবামটা একেবারে ক্রিমিনালদের আর্ট গ্যালারি।'

সোনালী বলল, 'উঃ, কী সব শয়তানদের নিয়ে কাজ করেছে মেসো! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়।'

বিকাশ বলল, 'এদের কাউকে নিয়ে একদিনও কাজ করতে হলে হার্টফেল করে মরে যেতাম।'

এদিকে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অ্যালবামের শেষ দিকে এসে একটা ফটো দেখে ভয়ানক চমকে উঠেছে সন্দীপ। অবিকল এই রকম ফটো তাদের বেনারসের বাড়িতেও রয়েছে। তার বাবা সুরেশ্বর দত্তর ত্রিশ বত্রিশ বছরের ছবি এটা। কিন্তু নিচে যে নামটা লেখা রয়েছে তা অন্য—ভূপতি মল্লিক। ফটোর তলায় ভূপতি মল্লিকের যে লাইফ স্কেচ রয়েছে তা এইরকম।

অমরনাথ লিখেছেনঃ লোকটা মারাত্মক ধূর্ত। আমার জীবনে অনেক ক্রিমিনাল নিয়ে কাজ করেছি কিন্তু এর জুড়ি সাড়া পৃথিবীর ক্রাইম ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। ভূপতি মল্লিকের কাজ হল, কলকাতা বম্বে দিল্লী জয়পুর—এই সব জায়গা থেকে দামী দামী হীরা চুরি করে বিদেশী এজেন্টদের কাছে বেচে দেওয়া। দেশের কোটি কোটি টাকার রত্ন এভাবে বিদেশে পাচার করে দিয়েছে। তাকে বেশ কয়েক বার ধরতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। লোকটা ভোজবাজি জানে। একবার জয়পুরে, আরেক বার বোম্বাইতে, দু-দু'বার মাত্র কুড়ি গজ দূরে তাকে দেখেও ধরা গেল না। তার কাছে পৌঁছুবার আগেই সে যেন বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

আমার কেরীয়ারে দু'জন মাত্র ক্রিমানালকে ধরে জেলে পুরতে পারি নি। তাদের একজন ডায়মণ্ড স্মাগলার এই ভূপতি মল্লিক। ধরতে না পারলেও এমন একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি যাতে তার হীরা চুরি এবং বাইরে পাচারের কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষেপে গিয়ে একটা চিঠিতে সে আমাকে শাসিয়েছে, এর ফল ভাল হবে না। প্রতিশোধ যেভাবেই হোক নেবে।

ভূপতি মল্লিকের ছবি এবং নিচে অমরনাথের নোট দেখতে দেখতে

সন্দীপের বুকের ভেতর নিঃশ্বাস আটকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে, হৃদ্‌পিণ্ড ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। পরক্ষণেই সে ভাবল, হুবহু একই রকম চেহারার মানুষ কি পৃথিবীতে দু'জন হতে পারে না? মনে মনে সে বলল, তা-ই যেন হয়, তা-ই যেন হয়।

হঠাৎ ফ্যানের হাওয়ায় ভূপতি মল্লিকের ছবির পাতাটা উল্টে আর একটা পাতা বেরিয়ে পড়ল। এখানে যে ছবিটা রয়েছে সেটাও সন্দীপের চেনা মনে হয়। কোথায় একে সে দেখেছে? কোথায়? একটু চিন্তা করতেই অদৃশ্য পর্দায় সিনেমার সেই স্লাইড ফুটে উঠল। পলাশপুর স্টেশনে এই লোকটাই, নির্জন ট্রেনের কামরায় জয়ন্তকে ছুরি মেরে বাইরে ফেলে দিয়েছিল। অবধারিত এই লোকটাই। কিন্তু তাকে অনেক দিন আগে ট্রেনের কামরাতেই শুধু না, আরো যেন কোথায় দেখেছে। কোথায়? কোথায়? এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না সন্দীপ। শ্বাসরুদ্ধের মতো নিচের লেখা পড়ে যেতে লাগল সে।

অমরনাথ লিখেছেন: এই মহাত্মাটির নাম বুলাকিলাল। ইউ-পি'র লোক। ভূপতি মল্লিকের সে ডান হাত। হীরা চুরি এবং পাচারে গুরুর মতোই তার স্কিল। তবে আরো অনেক গুণের আধার সে। ছুরি চালাতে ওস্তাদ এবং তার রিভলবারের তাক মারাত্মক; জুডো-টুডোও জানে। বুলাকির ক্রেডিটে চারটে মার্ডার, দশটা জখম রয়েছে। বুলাকি আর ভূপতি আমার জীবনে এই দুটোই একমাত্র ফেলিওর।

পড়তে পড়তে হঠাৎ সন্দীপের মনে হল, ছবির এই লোকটাকে অর্থাৎ বুলাকিকে বেনারসে তাদের বাড়িতে দু-চার বার আসতে দেখেছে। সে এলেই বাবা তাকে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। বোঝা যায়, লোকটা বাবার খুবই অনুগত এবং তার সঙ্গে বাবার খুব গোপন কোন একটা সম্পর্ক আছে।

এই লোকটার সঙ্গে ভূপতি মল্লিক বা সুরেশ্বরের যোগাযোগ না থাকলে ভাবা যেত, পৃথিবীতে ফ্রিক অফ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির খেয়ালে অবিকল একই চেহারা নিয়ে দু'জন মানুষ জন্মেছে। কিন্তু তাদের

দু'জনেরই ডান হাত বা ভক্ত বুলাকিলাল হবে কেন? ভূপতি মল্লিকই কি তবে সুরেশ্বর? নাম বদলে বেনারসে গিয়ে আছেন? সন্দীপের বুকের ভেতর প্রচণ্ড ঝড়ের মতো কিছু বয়ে যেতে লাগল। কেউ যেন চাপা গলায় তার কানের কাছে অনবরত ফিস ফিস করতে লাগল, 'সেটাই সম্ভব,'সেটাই সম্ভব।'

পরমুহূর্তেই সন্দীপের মনে পড়ল, আজ খানিকটা আগে তারা অমরনাথকে বেনারসের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে। অমরনাথ তাদের বাড়ির ঠিকানাও নিয়ে গেছেন। তার মানে কালই সুরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। তারপর কী হতে পারে, ভাবতে সাহস হল না সন্দীপের। যে-ভাবেই হোক, বাবার সঙ্গে বাঘা সি. বি. আই. অফিসার অমরনাথের দেখা হবার আগেই তাকে বেনারস পৌঁছুতে হবে। আচ্ছন্নের মতো উঠে দাঁড়াল সন্দীপ। বলল, 'চলি বিকাশ।'

বিকাশ ~~সন্দীপ~~ একটু অবাকই হল, 'এখন যাবি মানে! খাওয়া দাওয়ার পর ড্রাইভার তোকে হস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'না, আমাকে এখনই যেতে হবে।' সন্দীপ পা বাড়িয়ে দিল, 'খাওয়ার সময় নেই।'

আগে লক্ষ্য করে নি বিকাশরা। এবার স্থির চোখে সন্দীপকে দেখতে দেখতে চমকে উঠল। তার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কিসের এক আতঙ্ক এবং ভয় তার ওপর নিদারুণ ছাপ ফেলেছে! কয়েক মিনিটের ভেতর একটা মানুষের চেহারা এত বদলে যেতে পারে, তা যেন ভাবা যায় না। উদ্বিগ্ন মুখে বিকাশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রে সন্দীপ?'

'কিছু না।'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, আমি ঠিক আছি। আচ্ছা চলি—' ড্রইং রুম থেকে বেরিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে হাঁটতে লাগল সন্দীপ।

বিকাশ আর সোনালীও তার পেছন পেছন চলেছে। বিকাশের

উৎকণ্ঠা ক্রমশঃ বাড়ছিলই। সে বলতে লাগল, 'কী হয়েছে তোর, বলবি তো।'

তক্ষুনি উত্তর দিল না সন্দীপ। লন এবং বাগানের মাঝখান দিয়ে সুড়ির রাস্তা পেরিয়ে গেটের কাছে এসে বলল, 'বললাম তো কিছু হয় নি। আমাকে এখনই বেনারস যেতে হবে।'

এর জন্য তৈরি ছিল না কেউ। বিমূঢ় ভঙ্গিতে বিকাশ বলল, 'এখন বেনারস যাবি!'

'হ্যাঁ, যেতেই হবে।'

'কেন? হঠাৎ কী হল, মাথামুণ্ডু তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে গেট খুলে বাইরের রাস্তায় গিয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল সন্দীপ।

পেছন থেকে চিৎকার করে বিকাশ ডাকতে লাগল, 'সন্দীপ, সন্দীপ—'

তার সঙ্গে সোনালীর গলার স্বরও মিশতে থাকে, 'সন্দীপদা— সন্দীপদা—'

কিন্তু সন্দীপের কানে এ সব ডাক পৌঁছয় না। ততক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গেছে।

পকেটে পঞ্চাশ-ষাটটা টাকা ছিল। গড়িয়াহাট রোডে এসে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল সন্দীপ। সেটা নিয়ে যখন সে ফের হাওড়ায় পৌঁছল তখন বেনারসে যাবার আর ট্রেন নেই; অনেক আগেই সব চলে গেছে।

এনকোয়ারিতে খবর নিয়ে জানা গেল, কাল সন্ধের আগে কোন ট্রেন নেই। এত কম সময়ে রিজার্ভেসনের প্রশ্নই ওঠে না; সব সীট কুড়িদিন আগে বুকড হয়ে আছে। তবে যে দুটো বগি বিনা রিজার্ভেসনে ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় তাতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভিড়ের

কারণে এ জাতীয় কামরায় ওঠাই মুশকিল। তবু সন্দীপ চেষ্টা করবে। কালকের প্রথম ট্রেনে তাকে বেনারসে যেতেই হবে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে সন্দীপ আর হস্টেলে ফিরল না। যাদবপুরের লাস্ট বাস তখনও চলে যায় নি। ইচ্ছা করলেই সে ফিরতে পারে কিন্তু কিছুই ভাল লাগছে না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সারারাত এবং পরের দিন সন্ধে পর্যন্ত সে ঘুরে বেড়াল। তারপর ভিড় এবং ঠেলাঠেলির ভেতর প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিতেই বোধহয় ট্রেনের আন-রিজার্ভড কামরায় উঠল। উঠল ঠিকই কিন্তু বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। গোটা রাত দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

আগের রাতটা কেটেছে রাস্তায় রাস্তায়। তার মানে দু-দুটো রাত না ঘুমিয়ে কেটে গেল তার।

পরের দিন সকালে সন্দীপ যখন বেনারসে নামল, তার মাথার শিরা-গুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে। চোখদুটো রক্তের ডেলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু শারীরিক কষ্টের অনুভূতিগুলো সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে সোজা বেনিয়াবাগে রওনা হল। চারপাশে কাশীর হাজার হাজার সাইকেল রিক্সা, জনস্রোত, বাড়িঘর, কিছুই যেন সে দেখতে পাচ্ছিল না।

বাড়ি পোঁছুতে পোঁছুতে ন'টার মতো বেজে গেল। কোন রকমে রিক্সাওলার ভাড়া চুকিয়ে কড়া নাড়তেই সুরেশ্বর দরজা খুলে দিলেন। এক মুহূর্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সামান্য হেসে সস্নেহে বললেন, 'আয়। আমি জানতাম তুই আজই আসবি। তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

বাবার সঙ্গে অমরনাথের কি তা হলে দেখা হয় নি? না হলে তার জন্য অপেক্ষাই বা করবেন কেন? এত অবিচলিত আর নিশ্চিন্ত আছেন কি করে? তবে কি ভূপতি মল্লিকের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য ছাড়া

অন্য কোন সম্পর্কই নেই বাবার ? ভেতরে ভেতরে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল সন্দীপ কিন্তু পরক্ষণেই বুলাকিলালের মুখ তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক উৎকণ্ঠা এবং অস্বস্তি তার বুকের ভেতরটা চুরমার করে দিতে লাগল।

সন্দীপ কয়েক পলক সুরেশ্বরের দিকে তাকিয়ে থাকল। তাঁকে ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর আচ্ছন্নের মতো বাড়ির ভেতর ঢুকল। নিঃশব্দে বাবার পেছন পেছন দোতলায় উঠে এল।

সুরেশ্বর বললেন, 'তোর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, কত দিন খাস নি, ঘুমোস নি।'

অস্পষ্ট গলায় কিছু একটা উত্তর দিল সন্দীপ।

সুরেশ্বর বললেন, 'স্নান-খাওয়া সেরে আগে একটু ঘুমিয়ে নে। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

সন্দীপ অনেক কষ্টে গলার স্বরটা পরিষ্কার করে এবার বলল, 'কিন্তু বাবা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে সুরেশ্বর বললেন, 'আগে যা বলছি তাই কর। পরে কথা হবে।' বলেই, গলা চড়িয়ে সুরেশ্বর ডাকতে লাগলেন, 'নির্মলা, নির্মলা—'

নির্মলা সন্দীপের মায়ের নাম। মধ্যবয়সিনী এই মহিলা একদা আশ্চর্য রূপসী ছিলেন। স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার ; এত বয়সেও শরীরের বাঁধুনি ছিল অটুট। মা ছিলেন ভীষণ হাসিখুশি, আমুদে। এমন প্রাণবন্ত মানুষ খুব কমই চোখে পড়ে। সেই মাকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। কলকাতায় যাবার সময়ও সন্দীপ কত ভাল দেখে গিয়েছিল তাঁকে ! এখন মায়ের চোখ গর্তে ঢুকে গেছে, গাল ভেঙেছে, কণ্ঠার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে গজালের মতো। চুল উস্কখুস্ক, তাকানোটা কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত। লালচে চোখ ফোলা ফোলা। মনে হয় একটু আগে কাঁদছিলেন।

মাকে দেখে বুকের ভেতরটা নিদারুণ কোন আশঙ্কায় তোলপাড় হয়ে

যেতে লাগল। অস্থির অবরুদ্ধ গলায় সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মা তোমার?'

উত্তর না দিয়ে ধরা ভাঙা গলায় নির্মলা বললেন, 'একটু জিরিয়ে তুই স্নান করে আয়।'

সুরেশ্বর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'কী বলেছিলাম তোমাকে! দেখলে তো, সোনু ঠিক চলে এসেছে। আসতেই হবে ওকে।'

নির্মলা উত্তর দিলেন না।

সন্দীপ বুঝতে পারল, তার সম্বন্ধে মা-বাবার আগেই কিছু কথাবার্তা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস না করে কোন রকমে স্নানটা চুকিয়ে নাকেমুখে কী একটু গুঁজল, নিজেই জানে না। ভাত-ডাল-মাছ-তরকারির আস্বাদ পাবার মতো মনের অবস্থা এখন তার নয়।

খেয়েদেয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ল, দোতলার বিশাল বারন্দার এক ধারে একটা তক্তাপোষে সুরেশ্বর বসে আছেন। তাঁর হাতেব কাছে টেলিফোন। সন্দীপ সোজা তাঁর কাছে চলে এল। নির্মলা তার খাওয়ার সময় খাবার ঘরে ছিলেন। তিনিও সুরেশ্বরের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

সুরেশ্বর ছেলেকে বললেন, 'সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছিস। একটু ঘুমিয়ে নে।'

সন্দীপ জানালো, এখন তার ঘুম আসছে না। যে কথাটা বলার জন্য দু-দুটো দিন প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে তার কেটেছে এবার তাকে তা বলতেই হবে। উৎকণ্ঠিতের মতো সে বলল, 'বাবা—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে সুরেশ্বর বললেন, 'তুই কী বলবি, আমি জানি। অমরনাথবাবুর কথা তো?'

সন্দীপ চমকে উঠল, 'হ্যাঁ, কিন্তু—'

খুব শান্ত গলায় সুরেশ্বর বললেন, 'তাঁর জন্যেই তো তুই কলকাতা থেকে দৌড়ে এসেছিস, তাই না?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কি করে?'

'আমি সব জানি।' বলে একটু থামলেন সুরেশ্বর। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'কলকাতায় যখন তুই পড়তে গেলি তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল তোর সঙ্গে অমরনাথবাবুর দেখা হবে। যাক, অমরনাথবাবু কাল বেনারসে এসেছেন।'

অবরুদ্ধ গলায় সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে ?'

'না। দু'বার উনি আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আমি দেখা করি নি। চাকরদের দিয়ে জানিয়েছি আমি বাড়ি নেই। আসলে—'

'কী ?'

'আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

চাপা গলায় সন্দীপ এবার বলল, 'বাবা, অমরনাথবাবুর বাড়িতে একটা পুরনো অ্যালবামে ভূপতি মল্লিক বলে একটা লোকের ফটো দেখেছি। ঠিক তোমার মতো চেহারা। আর—'

'আর কী ?'

'বুলাকিলাল বলে যে লোকটা তোমার কাছে আসে তার ফটোও ঐ অ্যালবামটায় রয়েছে।'

সুরেশ্বর কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন।

শ্বাসরুদ্ধের মতো সন্দীপ এবার বলল, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা; তুমি শুধু বল ভূপতি মল্লিক অন্য লোক। সে আর তুমি এক নও।'

সুরেশ্বর বললেন, 'এ সব কথা এখন থাক। তুই আমার সঙ্গে এখন এক জায়গায় যাবি।'

'কোথায় ?'

'চল না, গেলেই বুঝতে পারবি।'

এই সময় ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন নির্মলা। জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'না-না, না-না—'

সুরেশ্বর অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন, 'অবুঝ হয়ো না নির্মলা। তোমাকে তো সব বলেছিই। যা স্থির করেছি তা আমাকে করতে দাও।

এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। সবই কৃতকর্মের ফল।' বলে ফোন তুলে ডায়াল করে বুলাকিলালকে ধরলেন। তাকে বললেন, 'তুমি বাড়িতে থেকো, আমি আধ ঘণ্টার ভেতর আসছি।' তারপর থানায় ফোন করে অফিসার-ইন-চার্জকে বললেন, 'আমি সুরেশ্বর দত্ত বলছি, দয়া করে পুলিশ ফোর্স নিয়ে বেনারস হোটেলের দোতলায় চলে যান।'

ও-সি ত্রিপাঠী সুরেশ্বরকে বহুদিন ধরে চেনেন। লাইনের ওধার থেকে বললেন, 'কী ব্যাপার দত্তজী, ওখানে যেতে বলছেন কেন?'

'জরুরি ব্যাপার। গেলে আপনার উপকারই হবে।'

'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই যাব।'

ত্রিপাঠীর সঙ্গে কথা বলার পর বেনারস হোটেলে অমরনাথকে ফোন করলেন সুরেশ্বর। নিজের নাম জানিয়ে বললেন, 'আপনি দু'বার আমাদের বাড়ি এসেছেন কিন্তু আমার পক্ষে দেখা করা সম্ভব হয় নি। এ জন্যে ক্ষমা করবেন। আমি নিজে গিয়ে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করছি।'

ওধার থেকে বিব্রতভাবে অমরনাথ বললেন, 'ক্ষমা টমার কথা বলে লজ্জা দেবেন না। কখন আসবেন বলুন, আমি অপেক্ষা করব।'

সুরেশ্বর বললেন, 'খুব বেশি হলে মিনিট চল্লিশেক।'

'ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছি।'

'আমিও।'

ফোন নামিয়ে রেখে সুরেশ্বর সন্দীপের দিকে তাকালেন। বললেন, 'চল্—'

নির্মলার কান্না কয়েক গুণ বেড়ে গেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে, উন্মত্তের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে সমানে তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'না-না, না-না—'

অসহ্য এক যন্ত্রণায় গলাটা বুজে যাচ্ছিল সন্দীপের। মনে হল

সেখানে প্রচণ্ড শক্ত ডেলার মতো কী আটকে আছে। কোন রকমে জড়ানো গলায় সে ডাকল, 'বাবা—'

স্থরেশ্বর ছেলের দিকে তাকালেন, 'কিছু বলবি ?'

'তুমি—তুমি—'

'আমি কী ?'

'অমরনাথবাবুর হোটেলে যেও না।'

তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেকে লক্ষ্য করতে লাগলেন স্থরেশ্বর।

সন্দীপ ফের বলল, 'তুমি বেনারস ছেড়ে কোথাও চলে যাও।'

স্থরেশ্বর পলকের জন্য বিচলিত হয়ে পড়লেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে শক্ত করে নিলেন। 'এখন আর তা হয় না' বলেই সন্দীপের একটা হাত ধরে খানিকটা এগিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে লাগলেন। যন্ত্রচালিতের মতো সন্দীপ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল।

অমরনাথকে স্থরেশ্বর ফোনে জানিয়েছিলেন চল্লিশ মিনিটের ভেতর যাচ্ছেন। কিন্তু তার অনেক আগেই একটা টাঙ্গা নিয়ে ভেলুপুরার গলি থেকে বুলাকিলালকে তুলে বেনারস হোটেলে পৌঁছে গেলেন।

বুলাকিলালকে দেখে চমকে উঠেছে সন্দীপ। বায়োস্কোপের সেই ছবিটা আবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। নিঃসন্দেহে এই লোকটাই পলাশপুর স্টেশনে ছুরি মেরে জয়ন্তকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়েছিল। হৃদ্‌পিণ্ডের উত্থানপতন স্তব্ধ হয়ে গেল সন্দীপের। কী অনিবার্য ভয়াবহ পরিণতির দিকে তারা চলেছে, ভাবার মতো শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগল তার।

হোটেল কম্পাউণ্ডে কয়েক জন পুলিশকে দেখা গেল।

এই জায়গাটা অর্থাৎ গোধুলিয়ায় এখন প্রচণ্ড ভিড়। অজস্র সাইকেল রিক্সা এবং মানুষজনে চারদিক গিজগিজ করছে।

অন্য কোনদিকে লক্ষ্য নেই বুলাকিলালের। পুলিশ দেখে সে ভয়ানক ঘাবড়ে গেল। সুরেশ্বরের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এত পুলিশ কেন?'

সুরেশ্বর বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর। বুঝতে পারবে।' বলেই তাদের নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলের দোতলায় উঠে এলেন। সেখানে করিডরের মাঝামাঝি পুলিশ অফিসার ত্রিপাঠী দাঁড়িয়ে আছেন।

বুলাকিলাল কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ও-সি ত্রিপাঠী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'আপনার কথামতো চলে এসেছি দত্তজী।'

'ধন্যবাদ। আসুন আমার সঙ্গে।'

খুঁজে খুঁজে দোতলার শেষ মাথায় অমরনাথের স্যুইটটা বার করলেন সুরেশ্বর। বেল টিপতে অমরনাথই দরজা খুলে দিলেন। অনেক দিন পর হলেও সুরেশ্বর এবং বুলাকিকে চেনা চেনা মনে হয় তাঁর। পলকহীন স্থির চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

এদিকে বুলাকিলাল অমরনাথকে চিনে ফেলেছে। কয়েক পা পিছিয়ে সে দৌড়ে পালাবার ফিকিরে ছিল। সুরেশ্বর ও-সিকে বললেন, 'ওকে ভাগতে দেবেন না ত্রিপাঠীজি। ধরে রাখুন।'

ত্রিপাঠী বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বুলাকিকে ধরে ফেললেন।

অমরনাথ তাকিয়েই ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার? কে আপনি?'

সুরেশ্বর বললেন, 'আমি সুরেশ্বর দত্ত। আমার অন্য একটা নামও আছে।'

স্বপ্নোত্থিতের মতো অমরনাথ বললেন, 'ভূপতি মল্লিক।'

'ঠিক ধরেছেন স্যর। আমি যেমন সুরেশ্বর দত্ত তেমনি ভূপতি মল্লিকও।' বলে বুলাকিকে দেখিয়ে সুরেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'একে চিনতে পারছেন?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলাল।'

'না চিনলেই অবাক হতাম। এ-ই আপনার ছেলে জয়ন্তকে খুন

করেছে।'

বুলাকীলাল চিৎকার করে উঠল, 'আমি খুন করেছি ঠিকই। কিন্তু হুকুম দিয়েছিল কে? মনে করছ আমাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে পার পেয়ে যাবে? কভী নেহী। ফাঁসিতে ঝুললে দু'জনেই একসঙ্গে ঝুলব।'

সুরেশ্বর বললেন, 'অবশ্যই নিজের দায়িত্ব আমি একেবারেই অস্বীকার করছি না।' বলে ফের অমরনাথের দিকে তাকালেন, 'আমাদের দু'জনকে ধরবার জন্যে বছরের পর বছর সারা দেশ আপনি তোলপাড় করে ফেলেছেন। কিন্তু পারেন নি। কোনদিন পারতেনও না। শুধু এই ছেলেটার জন্যে ধরা দিতে হল—' বলে একটা হাত ধরে সন্দীপকে সামনে টেনে নিয়ে এলেন।

এতক্ষণ সন্দীপকে লক্ষ্য করেন নি অমরনাথ। অবাক হয়ে বললেন, 'এ কি, তুমি! কবে বেনারস এলে?'

সন্দীপ বলল, 'আজই। খানিকক্ষণ আগে।'

সুরেশ্বর অমরনাথকে বললেন, 'স্যর, আপনার সঙ্গে দু-একটা দরকারী কথা আছে। একটু বসতে পাবলে ভাল হয়। যদি দয়া করে ভেতরে যাবার অনুমতি দেন—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

সবাই ভেতরে এসে বসল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুরেশ্বর আস্তে আস্তে শুরু করলেন, 'স্যর, আমার অতীত সম্বন্ধে আপনি সবই জানেন। আপনি আমাকে ধরতে না পারলেও এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। প্রতিশোধ নেবার জন্যে বুলাকিকে দিয়ে আপনার ছেলেকে খুন করালাম। তারপর পালিয়ে এলাম কাশীতে। নিজের নাম পাল্টে বেনারসী শাড়ির বিজনেস শুরু করলাম। সৎ এবং ভদ্রভাবে জীবন যাপন করতে করতে সত্যিসত্যি বদলে গেলাম। বিয়ে করলাম, দুটি ছেলে হল। এমন ছেলে যাদের নিয়ে গর্ব করা যায়।'

একটানা কথাগুলো বলে একটু দম নিলেন সুরেশ্বর। তারপর আবার আরম্ভ করলেন, 'যা হোক, আমার ছোট ছেলে সোনু মানে সন্দীপ একটু বড় হবার পর আপন মনে সে যা যা বলত তাতে মনে হল, ছেলেটা জাতিস্মর। পূর্বজন্মের কথা সে ভোলে নি। আরো বড় হবার পর বুঝলাম, ও আপনার, আপনার স্ত্রী আর আপনাদের বাড়ির কথা বলছে। বুঝলাম জয়ন্তই সন্দীপ হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। কত বড় আয়রনি আর ড্রামা বুঝুন, একজন বাঘা পুলিশ অফিসারের ছেলে কিনা একজন দুর্দান্ত ক্রিমিনালের ঘরে জন্মাল!'

অমরনাথ উত্তর দিলেন না।

সুরেশ্বর বলতে লাগলেন, 'বি. এস-সি পাশ করার পর ও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চাইল। ইউ-পি'র কোথাও সীট মিলল না। পাওয়া গেল সেই যাদবপুরে। ওর কলকাতায় যাবার ব্যাপারে আমার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। পরে ভাবলাম, অত বড় শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আপনার সঙ্গে ওর দেখা হবে না। আবার ভয়ও হল, যদি হয়? ভয়টাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। এ এক রকম ভালই হয়েছে। এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জন্মেই করে যাবার সুযোগটা পাওয়া গেল। পরের জন্মে এর জের টানতে হবে না। ধরা দেবার জন্যে আমার বন্ধু পুলিশ অফিসার ত্রিপাঠীকে খবর দিয়ে এনেছি। দয়া করে তিনি এসেছেন—' এই পর্যন্ত বলে অমরনাথের মুখের দিকে তাকালেন সুরেশ্বর। আবার বললেন, 'স্যর, গত জন্মে আমি আপনার ছেলেকে খুন করেছিলাম, এই জন্মে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে ওকে গ্রহণ করুন।' সন্দীপের একটা হাত ধরে অমরনাথের দিকে এগিয়ে দিলেন সুরেশ্বর।

সম্মোহিতের মতো শুনে যাচ্ছিলেন অমরনাথ। বললেন, 'কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই।'

ভাঙা ঝাপসা গলায় সন্দীপ বলে উঠল, 'বাবা, এ আপনি কী করছেন!'

'ঠিকই করছি সোনু। আমি তো আসলে তোর হত্যাকারী—

মার্ডারার। ক'টা বছরের জন্যে এ জন্মে তুই আমার কাছে থেকে গেলি।' বলতে বলতে গলা বুজে এল সুরেশ্বরের।

'কিন্তু মা, দাদা, ওদের—'

সন্দীপের কথা শেষ হবার আগেই সুরেশ্বর বলে উঠলেন, 'ওদের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তোর দাদা এসে নির্মলাকে দিল্লী নিয়ে যাবে। এখানকার বাড়ি ব্যবসা বেচে যা পাওয়া যাবে আর ব্যাঙ্কে যা আছে, সমান তিন ভাগ করে এক ভাগ পাবি তুই, এক ভাগ পাবে তোর দাদা, এক ভাগ তোর এ জন্মের মা।'

অমরনাথ বললেন, 'এ আপনি কী করছেন সুরেশ্বরবাবু!' তাঁর মতো কড়া সি. বি. আই অফিসারের কণ্ঠস্বরও কাঁপা এবং শিথিল শোনাল।

সুরেশ্বর হাসলেন। শান্ত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'ডোণ্ট বী ইমোসনাল স্যর। আপনার মতো মানুষের আবেগপ্রবণ হওয়া মানায় না।' বলেই পুলিশ অফিসারের দিকে ফিরলেন, 'ত্রিপাঠীজি, আমি প্রস্তুত।'